কালেমার হাক্বীক্বত

অধ্যক্ষ হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জলিল
(এম এম, এম এ, বিসিএস)

www.AmarIslam.com http://khasmujaddedia.wordpress.com/

কালেমার হাক্বীক্বত

প্রণেতা ঃ

অধ্যক্ষ হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জলিল

এমএম, এমএ, বিসিএস

মহাসচিব ঃ আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামাআত

প্রাক্তন ডাইরেক্টর ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

উৎসর্গ

ওলিকুল সম্রাট গাউসুল আ'যম বড়পীর হযরত ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আন্হু এবং সুলতানুল হিন্দ আতায়ে রাসুল হযরত ছৈয়দ খাজা মুঈন উদ্দিন চিশ্‌তী ছুম্মা আজমিরী রাদি আল্লাহু আন্হু-এর পাক দরবারে, "কালেমার হাক্বীক্বত" গ্রন্থখানি কবুলিয়তের জন্য উৎসর্গ করা হ'ল।

বিনীত খাকছার

মুহাম্মাদ আবদুল জলিল

এমএম, এমএ, বিসিএস

www.AmarIslam.com http://khasmujaddedia.wordpress.com/

গ্রন্থকার ঃ অধ্যক্ষ হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জলিল
গ্রাম ঃ আমিয়াপুর, পোষ্ট ঃ পাঠান বাজার,
থানা ঃ মতলব (উঃ), জিলা ঃ চাঁদপুর

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৩ জামাদিউল আউয়াল, ১৪২৬ হিজরী
১ জুলাই ২০০৫ ইংরেজী
১৭ আষাঢ় ১৪১২ বাংলা

প্রকাশক ঃ সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র

কম্পিউটার ডিজাইন ঃ মোহাম্মদ ইক্বাল হোসাইন

মুদ্রণ ঃ মাল্টিমিডিয়া কমিউনিকেশন
২২৭/১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৯৩৪০৮০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ
১। **সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র**
১/১২, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১১৬০৭
২। **গাউসুল আযম জামে মসজিদ**
উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।
৩। **মোহাম্মদী কুতুব খানা**
আন্দর কিল্লা, চট্টগ্রাম।

হাদীয়া ঃ সাদা- ৭০.০০ পাউন্ড- ৫.০০

"KALEMAR HAQIQAT" Written by Principal Hafiz Mawlana Mohammad Abdul Jalil, Former Director : Islamic Foundation Bangladesh, Secretary General : Ahle sunnat Wal Jama'at, Bangladesh & Published by Sunni Gobesona Kendra.

Price : Taka 70.00 £ 5.00

www.AmarIslam.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ ইলাহ্ (১০টি প্রসঙ্গ)	০৫
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ রাসুল (দঃ)	৩৬
তৃতীয় অধ্যায় ঃ রাসুলের ক্ষমতা	৪১
চতুর্থ অধ্যায় ঃ রাসুল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা	৪৩
পঞ্চম অধ্যায় ঃ বাইআতের হাক্বীক্বত	৪৭
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ রিসালাতে বিশ্বাস করার ৩টি শর্ত	৪৮
সপ্তম অধ্যায় ঃ রাসুলের মর্যাদা	৫০
অষ্টম অধ্যায় ঃ রাসুল হলেন আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম	৫২
নবম অধ্যায় ঃ একটি সংশয় ও জবাব	৫৪
দশম অধ্যায় ঃ নবী (দঃ)	৫৭
একাদশ অধ্যায় ঃ বিরোধীদের তিনটি আপত্তি খন্ডন	৬০
দ্বাদশ অধ্যায় ঃ নবীজির ইল্‌ম	৬২
ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ অন্যান্য নবীগণের ইলমে গায়েব	৬৭
চতুর্দশ অধ্যায় ঃ প্রিয়নবী (দঃ) -এর কিছু ইলমে গায়েব	৬৮
পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ শাফাআত বিষয়ক কতিপয় জ্ঞাতব্য	৭৩
ষোড়শ অধ্যায় ঃ ঈমান ও তার সংজ্ঞা	৭৬
সপ্তদশ অধ্যায় ঃ রাসুল ও অন্যান্যদের মধ্যে পার্থক্য (এক নজরে)	৭৭

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"কালেমার হাক্বীক্বত" রচনার উদ্দেশ্য

ইসলামের মূল ভিত্তি হলো ৫টি - (১) কালেমা (২) নামায (৩) রেযা (৪) হজ্ব (৫) যাকাত। এই পাঁচটির মধ্যে কালেমা হলো মূল। এর মূল কথা হলো তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাস। কালেমা তাইয়্যেবায় "ইলাহ" ও "রাসুল" দুইটি পরিভাষা রয়েছে। এই দুইটি শব্দের ব্যাখ্যা বিভিন্ন জনে বিভিন্ন রকমে করেছেন। কালেমা তাইয়্যেবায় আল্লাহর পরিচয় দেয়া হয়েছে "ইলাহ" বলে এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিচয় দেয়া হয়েছে "আল্লাহর রাসুল" বলে। তাই "ইলাহ" ও "রাসুল" শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানা প্রত্যেকের দরকার। অত্র পুস্তকে তারই প্রচেষ্টা করা হয়েছে। জামাআতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মউদূদী সাহেব লিখেছেন "কলেমার হাকীকত" এবং দ্বিতীয় আমির আবদুর রহীম সাহেব লিখেছেন তারই অনুবাদ স্বরূপ "কলেমা তাইয়্যেবা" নামক পুস্তক। তারা "ইলাহ্ ও রাসুলের" যে পরিচয় দিয়েছেন -তা ঈমানের জন্য যথেষ্ঠ নয় -বরং কোন কোন উক্তিতে কুফরীর আভাস পাওয়া যায়। তাদের ব্যাখ্যা খুবই বিতর্কিত- যা ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই তারই জবাব হিসাবে লিখা হলো অত্র **"কালেমার হাকীকত"** নামক পুস্তকখানি। সাধারণ মানুষ মাত্রই ভুলত্রুটির উর্দ্ধে নয়। অধম লেখকেরও ভুলত্রুটি হতে পারে। দলীল ভিত্তিক গ্রহণযোগ্য সংশোধনী আসলে তা অবশ্যই পরবর্তী সংস্করনে সন্নিবেশিত করার ইচ্ছা রইল।

-অধম লেখক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"কালেমা তৈয়্যেবা"য় বলা হয়েছে-
"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্"

এই কালেমাতে আল্লাহর পরিচয় দেয়া হয়েছে 'ইলাহ্' বলে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পরিচয় দেয়া হয়েছে "আল্লাহর রাসুল" বলে। এখন জানতে হবে- "ইলাহ্" শব্দের অর্থ কী? "রাসুল" শব্দের অর্থ কী?

প্রথম অধ্যায় ঃ

ইলাহ্

ইলাহ্ শব্দের মূলধাতু কি? উলুহিয়ত -এর ভিত্তি কিসের উপর? ইলাহ্ বা মা'বুদের একক বৈশিষ্ট কি?

"ইলাহ্" শব্দটি ঐশীবানী। কালেমা তৈয়্যেবা বা ঈমানের মূলমন্ত্র হলো তাওহীদ ও রিসালাত। অর্থাৎ- "উলুহিয়ত ও রিসালাত" -এই দু'টি শব্দ হচ্ছে ইসলামের মৌলিক দর্শন। তাই "ইলাহ্ ও রাসুল" সম্পর্কে মৌলিক এবং সঠিক ধারনা না থাকলে যেকোন মানুষ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে যেতে পারে। এই "ইলাহ্ ও রাসুল" নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। ব্যাখ্যারও অন্ত নেই। ইসলামী চিন্তাবিদ নামে পরিচয় দানকারীরা নিজেদের মনের মাধূরী মিশিয়ে ইচ্ছামত তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাই "ইলাহ্" ও "রাসুল" -এর ব্যাখ্যায় নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে- দেখা দিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ। এই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা ও মতবাদ দাঁড় করানোর কারণেই মুসলমানদের মধ্যে নিত্য নূতন ফের্কার সৃষ্টি হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। ফলে সরলপ্রাণ মুসলমানরা বিভিন্ন ব্যাখ্যার কারণে পছন্দমত বিভিন্ন গ্রুপে বা ফের্কার ফাঁদে পড়ে বিভ্রান্ত ও বিপদগামী হচ্ছে। "ইলাহ্ ও রাসুল" সম্পর্কে

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

যদি এক ও অভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়া হতো- তাহলে এই নব্য ফিত্‌নার সৃষ্টি হতো না।

প্রশ্ন জাগে- তাহলে অতীতে কি কোন একক ও সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি? অবশ্যই দেয়া হয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যে ইসলামী দর্শনের ইমামগণ গ্রন্থও রচনা করে গেছেন। ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রহঃ) ও ইমাম আবুল মনসুর মাতুরিদী (রহঃ) হলেন চার মাযহাবের স্বীকৃত আকায়েদের ইমাম। তাঁদের প্রণীত নীতিমালা ও ব্যাখ্যাই সঠিক ও নির্ভূল বলে স্বীকৃতি পেয়েছে- মুসলিম জাহানে। তাঁদের অনুসরণ করেই পরবর্তী আকায়েদের ইমাম ও বিশেষজ্ঞগণ আকায়েদের গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু ইদানিংকালে সঠিক ইসলামী জ্ঞানহীন কিছু উচ্চাকাঙ্খী বিপদগামী লোক মাযহাব ও তাকলীদকে অস্বীকার করে নিজেরাই ইসলামের ও কোরআন হাদীসের মনগড়া অপব্যাখ্যা তৈরী করে সরলমনা মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করছে এবং নূতন জামাত সৃষ্টি করছে। তারা "ইলাহ্" শব্দের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে পূর্বের ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করেছে। তারা ইমাম মানেনা, তাকলীদ মানেনা, মাযহাব মানেনা, এমনকি ইসলামের একক দর্শন এবং ব্যাখ্যাও মানেনা।

তাই "ইলাহ্" সম্পর্কে তাদের অপব্যাখ্যা প্রথমে আলোচনা করে তার কুফল ও অসারতা প্রমাণ করে তারপর সঠিক ও একক ব্যাখ্যা আলোচনা করা হবে- ইন্‌শা-আল্লাহ।

এই তথাকথিত ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে "ইলাহ্" বলা হয় একমাত্র ঐ পবিত্র সত্ত্বাকে-

১। যিনি গায়েব বা অদৃশ্য বিষয় জানেন।
২। যিনি সৃষ্টিতে একমাত্র নির্দেশদাতা।
৩। যিনি একমাত্র আরোগ্য দানকারী।
৪। যিনি একমাত্র সন্তান দানকারী।
৫। যিনি দূর থেকে শুনেন ও দেখেন।
৬। যিনি সর্বত্র হাযির ও নাযির।

৭। যিনি মুশকিলকুশা বা বিপদ দূরকারী।
৮। যিনি একমাত্র হাজত রাওয়া বা মনোবাসনা পূর্ণকারী।
৯। যিনি অভিযোগ শ্রবণকারী ও একমাত্র সাহায্যকারী।
১০। যিনি সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও চিরস্থায়ী।

তাদের মতে "ইলাহ্" হওয়ার জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলো হলো মাপকাঠি। তাদের মতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানেন না, অন্য কেউ মুশকিলকুশা হতে পারেন না, অন্য কেউ মনোবাসনা পূরণ করতে পারেন না, অন্য কেউ সাহায্য করতে পারেন না, অন্য কেউ দূর থেকে শুনেন না এবং দেখেন না, অন্য কেউ হাযির হতে পারেন না- ইত্যাদি। তাদের মতে অন্য কাউকে উল্লেখিত গুণের অধিকারী মান্য করলে তাদের মতে শির্ক হবে এবং এই আক্বিদা পোষণকারীরা মুশরিকে পরিণত হবে। তাদের মতে এইসব গুণাবলীর অধিকারীই "ইলাহ্"। অন্য কাউকে মান্য করলে তাকে "ইলাহ্" বানানো হয়- ইত্যাদি।

বিঃদ্রঃ- তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- নবী, ওলী ও গাউস কুতুবগণের মোজিযা ও কারামতকে অস্বীকার করা এবং মোজিযা ও কারামতে বিশ্বাসী মুসলমানদেরকে মুশরিক বলে আখ্যায়িত করা।

এবার আমরা তাদের ভ্রান্ত ধারনা খন্ডন করার জন্য উক্ত ১০টি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখাবো যে, তারা "ইলাহ্" শব্দের যে সংজ্ঞা দিয়েছে- তা সঠিক নয়। তাদের সংজ্ঞা মেনে নিলে লক্ষ লক্ষ "ইলাহ্" প্রমাণিত হবে। তখন এক আল্লাহ আর "ইলাহ্" থাকবে না -বরং লক্ষ লক্ষ "ইলাহ্" হয়ে যাবে। তখন তাওহীদের উপরই আসবে বিরাট আঘাত।

১। প্রসঙ্গ ঃ গায়েব জানা

যারা বলেন- "ইলাহ্ তিনি- যিনি গায়েব জানেন" -তাদের কথা সত্য হলে বলতে হয়- উলুহিয়াতের ভিত্তি হচ্ছে ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞান। তাদের সংজ্ঞা মতে- তখন অনেক ইলাহ্ সাব্যস্থ হয়ে যাবে। যেমন- হযরত

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ঈছা আলাইহিস সালাম, হযরত খিযির আলাইহিস সালাম, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম- তাঁদের সবারই আল্লাহ্ প্রদত্ত ইলমে গায়েব ছিল। হযরত ঈছা আলাইহিস সালামের ইলমে গায়ব ছিল মানুষের খাদ্য ও সংরক্ষিত মালামাল সম্পর্কে -যা কোরআন দ্বারাই প্রমাণিত। হযরত খিযির আলাইহিস সালামের ইলমে গায়ব বা ইলমে লাদুন্নী ছিল তিনটি বিষয়ে। তাও কোরআন দ্বারাই প্রমাণিত। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের ইলমে গায়ব ছিল- মানুষের ঈমান ও কুফর বিষয়ে- কে ঈমান আনবে, কে আন্‌বেনা- সে বিষয়ে। ইহাও কোরআন দ্বারাই প্রমাণিত। তাহলে তাঁরা কি ইলাহ্ বা মা'বুদ ছিলেন? নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু ইলমে গায়বকে ইলাহ্ হওয়ার মাপকাঠি সাব্যস্থকারীদের সংজ্ঞা অনুযায়ী তারা ইলাহ্ প্রমাণিত হন। এখন আমরা প্রমাণ করবো- উক্ত তিনজন নবীর ইলমে গায়ব কোরআন মজিদের কোন্ কোন্ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

ক) হযরত ঈছা আলাইহিস সালামের ইলমে গায়বঃ

আল্লাহ পাক হযরত ঈছা আলাইহিস সালামের ইলমে গায়েবের স্বীকৃতি দিয়ে এরশাদ করেন-

وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ-

অর্থাৎ- "হযরত ঈছা আলাইহিস সালাম তাঁর কওমকে লক্ষ্য করে বললেন- "তোমরা তোমাদের ঘরে কি কি খাচ্ছ এবং কি কি জিনিস জমা করে রাখছো- তা আমি না দেখেই তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নম্বর ৪৯)।

অত্র আয়াতে- বর্তমানে তারা কি খাচ্ছে, ভবিষ্যতে কি খাবে এবং বর্তমানে কি কি জিনিস জমা করছে, ভবিষ্যতে কি কি জমা করে রাখবে- তা তিনি না দেখেই বলে দিতেন। প্রথম শব্দটির মূলধাতু হলো نَبَاءٌ অর্থাৎ- অদৃশ্য সংবাদ। ইহা ছিল হযরত ঈছা আলাইহিস সালামের খাদ্য সংক্রান্ত ইলমে গায়েব -যার স্বীকৃতি দিচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। যদি গায়েব বা অদৃশ্য জানা

"ইলাহ্" হওয়ার ভিত্তি বা বৈশিষ্ট হয়- তাহলে ঈছা (আঃ) ইলাহ্ সাব্যস্থ হন। বুঝা গেল- ইলাহ্ সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যা সঠিক নয় এবং এর উপর ভিত্তি করে কোন নবীর ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য বিষয় জানাকে শির্ক বলাও সঠিক নয়।

খ) হযরত খিযির আলাইহিস সালামের ইলমে লাদুন্নী বা ইলমে গায়বঃ

আল্লাহ পাক সূরা কাহাফ -এর শেষাংশে হযরত মূছা আলাইহিস সালাম ও হযরত খিযির আলাইহিস সালামের তিনটি ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন- যার সারমর্ম হচ্ছে- "আল্লাহ পাক যখন হযরত মূছা আলাইহিস সালামকে জানালেন যে, আমার এক বিশেষ বান্দাকে (খিযির) ইলমে লাদুন্নী বা ইলমে আছরার (গোপন রহস্য) দ্বারা আমি ভূষিত করেছি। তখন মূছা আলাইহিস সালামের ইচ্ছা জাগলো তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার। আল্লাহ্ পাক বলে দিলেন- দুই নদীর সঙ্গমস্থলে উক্ত বান্দার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। আর উক্ত দুই নদীর মোহনা হলো ঐ জায়গায়- যেখানে ভুনা মাছ জীবিত হয়ে যায়। হযরত মূছা আলাইহিস সালাম নিজ খাদেম ইউশা আলাইহিস সালামকে সাথে নিয়ে মাছ ভুনা করে হযরত খিযিরের সন্ধানে বের হলেন। মিশর ও ফিলিস্তিনের এলাকায় দুই নদীর মোহনায় তাঁর ভুনা মাছ জীবিত হয়ে নদীতে চলে যায়। হযরত মূছা (আঃ) মাছের গমনের রাস্তা অনুসরণ করে নদীর পানে গিয়ে দেখলেন- হযরত খিযির আলাইহিস সালাম পানির উপর শুয়ে আছেন। পরিচয় হওয়ার পর দুই নবী একসাথে চলতে লাগলেন। কোন এক নদী পার হওয়ার জন্য তাঁরা উভয়ে এক মাঝির নৌকায় আরোহন করলেন। মাঝ নদীতে আসার পর হযরত খিযির (আঃ) নূতন নৌকাটির তলা ছিদ্র করে দিলেন। এর রহস্য বুঝতে না পেরে হযরত মূছা (আঃ) হযরত খিযির (আঃ) -এর কাজে আপত্তি করলেন।

পরবর্তী ঘটনা ছিল- এক খোলা মাঠে কতিপয় ছেলে খেলাধূলায় মেতে উঠেছিল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও বুদ্ধিমান ছেলেটিকে হযরত

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

খিযির (আঃ) লাঠির আঘাতে মেরে ফেললেন বিনা অপরাধে। এবারও হযরত মূছা (আঃ) রহস্য বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করে বসলেন। হযরত খিযির (আঃ) তাঁকে বিদায় করে দিতে চাইলে তিনি বললেন- আবার যদি প্রশ্ন করি- তাহলে আমাকে বিদায় করে দিবেন। অতঃপর তাঁরা চলতে চলতে এক পল্লীতে গিয়ে রাত্রি যাপনের জন্য পল্লীবাসীকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু পল্লীবাসীরা তাঁদেরকে স্থান দিলো না।

হযরত খিযির (আঃ) ঐ গ্রামেরই একটি ভাঙ্গা দেওয়াল ঠিক করার জন্য হযরত মূছা (আঃ) কে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানালেন। হযরত মূছা (আঃ) এবার আর ধৈর্য ধারন করতে পারলেন না এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেলেন। হযরত খিযির (আঃ) বললেন- এবার আপনাকে বিদায় দিলাম। আপনি আমার কর্মকান্ডের ব্যাপারে প্রশ্ন করছেন এর অন্তর্নিহিত গোপন রহস্য না জানার কারণে। তখন তিনি তিনটি ঘটনার গোপন রহস্য খুলে বললেন এবং মুছা আলাইহিস সালামকে বিদায় দিলেন।

হযরত মূছা (আঃ) একজন নবী হয়েও উক্ত গোপন এলেম সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। সমস্ত মোফাস্‌সেরীন বলেছেন- হযরত খিযির (আঃ) -এর উক্ত এলেম ছিল ইলমে গায়ব বা ইল্‌মে লাদুন্নী- যা মূছা (আঃ) কে দান করা হয়নি।

যারা বলেন- "ইলাহ্" তিনি- যিনি গায়েব জানেন"- তাদের মতানুযায়ী হযরত খিযির (আঃ) ও ইলাহ্ সাব্যস্থ হয়ে যান। (নাউযুবিল্লাহ)।

বুঝা গেল- ইলমে গায়েব ইলাহ্ হওয়ার মাপকাঠি নয়। কেননা, তাহলে একাধিক ইলাহ্ মানতে হবে- যা কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

গ) হযরত নূহ আলাইহিস সালাম -এর ইলমে গায়ব ঃ

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম দীর্ঘকাল হেদায়াত করে মাত্র ৭২ জনকে মু'মিন বানিয়েছিলেন। তাঁর হেদায়াতে অন্যরা কান দেয়নি। অবশেষে তিনি আল্লাহর কাছে ঐসব কাফেরদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রার্থনা

জানালেন এবং বললেন-

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا- إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا-

"হে আমার রব! এই পৃথিবীর বুকে কাফিরদের কোন জনপদকেই আর রেহাই দিওনা। কেননা, তাদেরকে রেহাই দিলে তারা তোমার নেক বান্দাদেরকে গোমরাহ্ করে ফেলবে এবং তাদের বংশে ভবিষ্যতে কাফের ফাজের ছাড়া আর কিছুই পয়দা হবেনা"। (সূরা নূহ, আয়াত ২৬)।

উক্ত আয়াতে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম বলে দিলেন- ভবিষ্যতে তাদের বংশে আর কোন মো'মেন সন্তান পয়দা হবেনা। এটাই তো ইলমে গায়ব। আল্লাহ পাক এই ইলমে গায়ব হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে দান করেছেন। যারা বলে- "যিনি গায়েব জানেন তিনিই ইলাহ্"। তাহলে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তো ইলাহ্ সাব্যস্থ হয়ে যান। (নাউযুবিল্লাহ্)।

বুঝা গেল- ইলমে গায়ব জানাই শুধু ইলাহ্ হওয়ার মাপকাঠি নয়।

২। প্রসঙ্গ ঃ সৃষ্টিতে নির্দেশ জারী করার ক্ষমতা ঃ

যারা বলে- "সৃষ্টিতে নির্দেশ জারী করেন যিনি- তিনি ইলাহ্"। পানি, চাঁদ, সুরুয- ইত্যাদির উপর নির্দেশ চালান ইলাহ্। তাহলে তাদের সংজ্ঞানুযায়ী বলতে হয়- হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালামকে "ইলাহ্" মানতে হবে। কেননা, তাঁর নির্দেশে বায়ূ চলাচল করতো। তিনি বায়ুর উপর নির্দেশ জারী করতেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ-

অর্থাৎ- "আমি (আল্লাহ) বায়ূকে সোলায়মানের অধীনস্থ করে দিয়েছি। তাঁর নির্দেশে যেখানে ইচ্ছা বায়ূ অবাধে চলাচল করে"। (সূরা ছোয়াদ,

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আয়াত ৩৬) তিনি আরো এরশাদ করেন-

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ-

অর্থাৎ- "আমি তীব্র গতির বায়ূকে সোলায়মানের অধীনস্থ করে দিয়েছে- যা তাঁর নির্দেশে প্রবাহিত হতো"। (সূরা ... আয়াত ...)।

উক্ত দুইটি আয়াতে পরিস্কার করে বলা হয়েছে- হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম -এর নির্দেশে স্বাভাবিক বায়ূ ও তীব্র বায়ূ চলাচল করতো। এই বায়ূকে বশ করেই তিনি সকাল সন্ধ্যায় সিংহাসনে আরোহন করে বায়ূর উপর দিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে সুদূর ইয়ামেনের সাবা শহরে শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করতেন স্ত্রী বিলকিসের সাথে সাক্ষাতের জন্য।

যে বায়ূর গতির উপর বৃষ্টি ও ফসল উৎপাদন নির্ভরশীল, **সেই বায়ুর উপর নির্দেশ জারী করতেন হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম।** যদি সৃষ্টিতে নির্দেশ জারীই "ইলাহ্" হওয়ার ভিত্তি হয়- তাহলে হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালামকেও "ইলাহ্" মানতে হবে। ইহা কি বিরুদ্ধবাদীরা স্বীকার করতে রাজী আছেন?

তাহলে বুঝা গেলো- তাদের ইলাহ্ সম্পর্কীত ব্যাখ্যাটিই ভুল।

৩। প্রসঙ্গ ঃ আরোগ্য দান করা ও জীবিত করা ঃ

ক) আরোগ্য দান করা মুলতঃ আল্লাহর কাজ- এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যারা বলে- "তিনিই ইলাহ্- যিনি আরোগ্য দান করেন"। তাদের এই সংজ্ঞা সঠিক হলে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ইলাহ্ মানতে হয়। (নাউযুবিল্লাহ)।

কেননা, তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁর জন্য ৪০ বৎসর পর্যন্ত কেঁদে কেঁদে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। অবশেষে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম আপন গায়ের জামা ভাইদের কাছে দিয়ে বলেছিলেন-

اِذْهَبُوا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَأْتِ بَصِيْرًا-

অর্থাৎ- "তোমরা আমার এই জামা নিয়ে যাও- আমার পিতার চেহারার উপর তা দিয়ে আচ্ছাদন করো- এতেই তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন"। (সূরা ইউসুফ,আয়াত ৯৩)।

বুঝা গেলো- হযরত ইউসুফের জামার মধ্যে রোগ প্রতিশেধক ছিল। তাহলে পোষাক কি ইলাহ্ হয়ে গেলো?

খ) আল্লাহ্ পাক হযরত আইউব আলাইহিস সালামের রোগমুক্তির ব্যাপারে তাঁর পদাঘাতের পানিকে প্রতিশেধক বলে আখ্যায়িত করেছেন। এরশাদ হচ্ছে-

اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ-

অর্থাৎ- "হে আইউব! তুমি আপন পা জমিনের উপর ঘর্ষণ করো। এতে প্রবাহিত পানি তোমার গোসল ও পান করার জন্য (রোগ মুক্তির জন্য) ব্যবস্থা করে দিলাম"। (সূরা ছোয়াদ, আয়াত ৪২)।

বুঝা গেল- হযরত আইউব আলাইহিস সালামের পদাঘাতে সৃষ্ট কুপের পানিতে রোগমুক্তি ও স্বাস্থ্য পুনরোদ্ধারের তাছির বিদ্যমান ছিল। রোগ মুক্তির পানি কি তাহলে ইলাহ্"?

গ) হযরত ঈছা আলাইহিস সালাম জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে ভাল করতেন এবং মৃতকে আল্লাহর নির্দেশে জীবিত করতে পারতেন। তিনি বলতেন-

وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ-

অর্থাৎ- **"আমি আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান করি, কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করি এবং মৃতকে জীবিত করি"।** (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪৯)।

www.AmarIslam.com http://khasmujaddedia.wordpress.com/

এতে দেখা যাচ্ছে- হযরত ঈছা আলাইহিস সালাম আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কুষ্ঠরোগী ও জন্মান্ধকে আরোগ্য দান করতেন এবং মৃতকে জীবিত করতেন। এ কাজে অথরিটি ছিল আল্লাহর নির্দেশ এবং কাজটি ছিল হযরত ঈছা আলাইহিস সালাম -এর। আরোগ্যদান করা যদি ইলাহ্ বা আল্লাহ হওয়ার মাপকাঠি হয়- তাহলে হযরত ঈছা (আঃ) কেও "ইলাহ্" মানতে হয়- অথচ তিনি ইলাহ্ ছিলেন না। প্রমাণিত হলো- বিরুদ্ধবাদীদের "ইলাহ্" সম্পর্কীত ব্যাখ্যাটিও সঠিক নয়।

ঘ) হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -এর আহ্বানে ৪টি মৃত পাখীর জীবন লাভ ঃ

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন- হাশরের দিনে কিভাবে মৃত প্রাণী পূণর্জীবিত হবে? আল্লাহ তা'য়ালা ৪টি পাখী কেটে টুকরা টুকরা করে পাহাড়ে নিক্ষেপ করার জন্য হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দিয়ে পূনরায় তাদেরকে নাম ধরে ডাক দিতে বললেন। হযরত ইবরাহীমের ডাকে পাখীগুলো জীবিত হয়ে গেলো। দেখা যাচ্ছে- তাঁর আহ্বানে মৃতরা জীবিত হয়েছে। তাহলে কি তিনি "ইলাহ্" বা আল্লাহ হয়ে গেছেন?

অতএব, যারা বলে- "ইলাহ্" তিনিই- যিনি আরোগ্য দান করেন এবং মৃতকে জীবিত করেন"। -তাদের এই ব্যাখ্যা ভুল। তাদের ব্যাখ্যা মতে তো হযরত ঈছা, হযরত ইউসুফ, হযরত আইউব ও হযরত ইবরাহীম আলাইহিমুস সালামগণ ইলাহ সাব্যস্থ হন। (নাউযুবিল্লাহ)।

৪। প্রসঙ্গ ঃ সন্তান দান করা

যারা বলে- "ইলাহ্ তিনিই- যিনি সন্তান দান করেন- অন্য কারো এই ক্ষমতা নেই" -তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই-

হযরত মরিয়ম (আঃ) কুমারী ছিলেন। তিনি পর্দাঢাকা স্থানে গোসল করার সময় হযরত জিবরাইল (আঃ) মানব আকৃতিতে উপস্থিত হয়ে বললেন-

إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا-

অর্থাৎ- "আমি আল্লাহর পক্ষ হতে বার্তা বহনকারী জিবরাইল। আমি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান দান করতে এসেছি" (সূরা মরিয়ম, ১৯ আয়াত)

এই কথা বলেই বিবি মরিয়মের জামার আস্তিনে একটি ফুঁক দিলেন। তাতেই হযরত ঈছা রুহুল্লা পয়দা হলেন।

দেখুন- ছেলে মেয়ে দান করার মালিক আল্লাহ্। তিনি যাকে চান- শুধু কন্যা সন্তান দান করেন। যাকে চান- শুধু পুত্র সন্তান দান করেন। যাকে চান- তাকে পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন- কিছুই দেন না। এটা আল্লাহর একক কৌশল ও কুদরত। কিন্তু এই আয়াতে "সন্তান দান করা" হযরত জিবরাঈলের (আঃ) জন্য খাস করে ব্যবহার করা হয়েছে- আল্লাহর জন্য নয়। أَهَبَ ক্রিয়া পদের فَاعِلٌ বা কর্তা হচ্ছেন হযরত জিবরাঈল (আঃ)। "আমি তোমাকে পুত্র সন্তান দিব"। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বিবি মরিয়মকে পুত্র সন্তান দান করেছেন- একথা বলা কি শির্ক- বা এতে কি হযরত জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহ বা "ইলাহ্" হয়ে গেলেন? যদি সন্তান দান করাই ইলাহ্ হওয়ার ভিত্তি হয়- তাহলে তাদের সংজ্ঞা মতে হযরত জিবরাঈল (আঃ)ও ইলাহ্ সাব্যস্থ হয়ে যান। এটা তো কোন মতেই মেনে নেয়া যায় না। বুঝা গেল- তাদের প্রদত্ত সংজ্ঞাটিই ভুল।

৫। প্রসঙ্গ ঃ দূর থেকে শুনা ও দেখা

যারা বলে- "ইলাহ্ তিনিই- যিনি দূর থেকে শুনেন ও দেখেন"। অর্থাৎ- ইলাহ্ বা আল্লাহ্ই একমাত্র দূর থেকে শুনেন ও দেখেন- অন্য কেউ নয়। তাদের এই ব্যাখ্যা মেনে নিলে হযরত সোলায়মান (আঃ) ও হযরত ইয়াকুব (আঃ) কেও ইলাহ্ মানতে হয়। যেমন-

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ক) হযরত সোলায়মান (আঃ) সসৈন্যে কোথাও যাচ্ছিলেন। এক জঙ্গলে পিপিলিকার দল রাস্তা অতিক্রম করছিল। অনেক দূর থেকে হযরত সোলায়মান (আঃ) শুনতে পেলেন- পিঁপড়ার সর্দার বলছে-

يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ-

অর্থাৎ- "হে পিঁপড়ার দল! তোমরা তাড়াতাড়ি গর্তে ঢুকে পড়ো- যাতে সোলায়মান ও তাঁর সৈন্যদল তাঁদের অজান্তে তোমাদেরকে পিষে মেরে না ফেলে" (সূরা নমল, ১৮ আয়াত)।

হযরত সোলায়মান (আঃ) তিন মাইল দূর থেকে পিঁপড়া সর্দারের ঐ আওয়াজ শুনতে পেয়ে হেঁসে ফেললেন। দেখুন- পিঁপড়ার আওয়াজ শুনা ও বুঝা- তাও আবার তিন মাইল দূর থেকে- এটা অন্য কারো পক্ষেই শুনা সম্ভব নয়। কিন্তু হযরত সোলায়মান (আঃ) শুনেছিলেন- যার সাক্ষ্য দিচ্ছে স্বয়ং কোরআন মজিদ। **দূর হতে শুনার কারণে কি হযরত সোলায়মান ইলাহ্ হয়ে গেছেন?**

খ) হযরত ইয়াকুব (আঃ) তৎকালীন কেনান- বর্তমান ফিলিস্তিন থেকে সুদূর মিশরে অবস্থানরত নিজ পুত্র হযরত ইউসুফ (আঃ) কে দেখেছিলেন। যখন বিবি যোলায়খা হযরত ইউসুফ (আঃ) কে ফুঁসলাচ্ছিলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) যোলায়খার বদ্ধ ঘরে নিজ পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) কে দেখে লজ্জায় মরে যাচ্ছিলেন। তিনি যোলায়খার যৌন অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য দৌঁড়ে পালাতে চেষ্টা করলেন- কিন্তু বিবি যোলায়খা পিছন থেকে দৌঁড়ে গিয়ে হযরত ইউসুফের জামা পিছন দিক থেকে টেনে ধরলেন। এতেও হযরত ইউসুফ (আঃ) কে আটকে রাখতে পারলেন না। অবশেষে নিজ নপুংসক স্বামী আযীয মিশরের কাছে ধরা পড়ে গেলেন। আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত ইউসুফ (আঃ) জন্মসূত্রে নিষ্পাপ ছিলেন। বিবি যোলায়খার হাজারো ফুঁসলানীতেও তাঁর পবিত্র চরিত্র অটল ছিল। তদুপরি- আপন পিতার গায়েবী উপস্থিতি দেখে তাঁর পবিত্রতার জোশ্ দ্বিগুন বেড়ে

গেলো। **এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে- হযরত ইয়াকুব (আঃ) সুদূর কেনান থেকে আপন পুত্রকে কিভাবে দেখলেন এবং কিভাবে সেখানে উপস্থিত হলেন? দূর থেকে শুনা আর দেখা-ই যদি ইলাহ্ হওয়ার মাপকাঠি হয়- তাহলে হযরত ইয়াকুবকেও ইলাহ্ বলতে হয়।** বিরোধী পক্ষ কি মানতে রাজী আছেন? হক্বপন্থী সুন্নী মুসলমানরা তো কস্মিনকালেও তা মানতে পারেননা। তাহলে বুঝা গেল- দূর থেকে শুনলে ও দেখলেই ইলাহ্ হয়ে যায় না। অথচ বিরোধী পক্ষ তাই বলছে। **তাদের ব্যাখ্যা মেনে নিলে হযরত সোলায়মান ও হযরত ইয়াকুব (আঃ) কেও ইলাহ্ বলে স্বীকার করতে হয়- যা সুস্পষ্ট শির্ক। এই শির্কের মধ্যেই ডুবে আছে বিরোধী পক্ষ।**

৬। প্রসঙ্গ ঃ হাযির- নাযির

প্রত্যেক জায়গায় হাযির হওয়া বা বিরাজমান হওয়া এবং প্রত্যেক জায়গা হাতের তালুর ন্যায় দেখা যদি উলুহিয়াতের দলীল হয়- তাহলে অসংখ্য ইলাহ্ মেনে নেয়া অপরিহার্য্য হয়ে পড়বে। যেমনঃ-

ক) শয়তান পৃথিবীর সর্বত্র হাযির ও নাযির; কিন্তু সে ইলাহ্ নয়।

মানবজাতিকে গোমরাহ করার জন্য শয়তান একই মূহুর্তে পৃথিবীর সর্বত্র হাযির হওয়া ও প্রত্যেকের রক্তে মাংসে প্রবেশ করার জন্য এবং সমগ্র মানবজাতিকে একই সময় দেখার শক্তি আল্লাহর নিকট থেকে চেয়ে নিয়েছে। আল্লাহ তাকে হাযির নাযির হওয়ার, ভিতরে প্রবেশ করার ক্ষমতা দান করেছেন। তাই বলে কি সে "ইলাহ্" হয়ে গেলো? সে তো নাপাক কাফের। সে তো দূরের কথা- হাযির-নাযির পবিত্র নবীগণও তো নিজেদেরকে "ইলাহ্" বলে দাবী করেন নি।

শয়তানের হাযির নাযির হওয়ার অকাট্য দলীল কোরআন মজিদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ-

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অর্থাৎ- "শয়তান ও তার বংশধরগণ তোমাদের (মানবজাতিকে) সকলকে এমন স্থান থেকে দেখে- যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাওনা"। (সূরা আ'রাফ- আয়াত ২৭)।

একটি মাত্র শয়তান ছয়শ' কোটি মানব সন্তানের কলবে ওঁৎ পেতে বসে থাকে বলে হাদীস শরীফেও উল্লেখ আছে। রক্তের কণায়, শিরায় উপশিরায়- সর্বত্র সে **একই** সময়ে উপস্থিত হতে পারে এবং দূর থেকেও দেখতে পারে। তাহলে নবী করিম (দঃ) কে হাযির নাযির বললে ওহাবীদের নাক কপালে উঠে কেন? তিনি তো পাক- তাঁর ক্ষমতা তো আরো বেশী হওয়ার কথা। বুঝা গেল- সর্বত্র হাযির নাযির হওয়া ইলাহ্ হওয়ার মাপকাঠি নয়। যদি তাই হতো- তাহলে শয়তানও ইলাহ্ হতো। (নাউযুবিল্লাহ্)।

খ) মালাকুত মউত হযরত আযরাঈল (আঃ) প্রাণী জগতের সর্বত্র হাযির নাযির; অথচ "ইলাহ্" নন।

আল্লাহ পাক হযরত আযরাঈল আলাইহিস সালামকে প্রাণী জগতের সর্বত্র হাযির নাযির করে রেখেছেন। একই সময়ে তিনি লক্ষ কোটি প্রাণীর প্রাণ হরণ করেন। আল্লাহ পাক তার উপস্থিতি ও বিরাজমানতার কথা এভাবে ঘোষণা করেছেন-

قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ-

অর্থাৎ- "তোমাদের প্রতি নিয়োজিত মালাকুল মউত (ফিরিস্তা) তোমাদের জান কব্জ করে"। (সূরা সাজ্দা, ১১ আয়াত) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ الْاَرْضَ لِمَلَكِ الْمَوْتِ كَالطَّشْتِ فِى الْيَدِ-

অর্থাৎ- "আল্লাহ তায়ালা সমগ্র পৃথিবীটাকে আযরাঈলের সামনে হাতের থালার মত করে রেখেছেন" (মিশকাত ও কুরতুবীর তাযকিরা)। অন্য এক

হাদীসে আছে- আযরাঈল দিনে ৫বার প্রত্যেকের অবস্থা দেখে। প্রত্যেকের অবস্থা সম্পর্কে সে পুরাপরি জ্ঞাত। অর্থাৎ- তিনি পৃথিবীর সর্বস্থানে একই সময়ে হাযির ও নাযির। আযরাঈলের এ অবস্থা হলে আমাদের প্রিয় নবীর অবস্থা কী হতে পারে?

গ) আসিফ বিন বরখিয়া একই সময়ে সিরিয়া ও সাবা নগরীতে হাযির ও নাযির -অথচ ইলাহ্ নন।

হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালামের উজির আসিফ বিন বরখিয়া এক মূহুর্তে চোখের পলক মারার চাইতেও কম সময়ের মধ্যে ইয়ামেন দেশের সাবা নগরীর রানী বিলকিসের সিংহাসন তুলে নিয়ে সিরিয়ায় বায়তুল মোকাদ্দাসে হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালামের দরবারে পেশ করেছিলেন।

আসিফ বিন বরখিয়া দাবী করে বলেছিলেন-

قَالَ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ-

অর্থাৎ- "আমি রানী বিলকিসের সিংহাসনটি আপনার (সোলায়মান) চোখের পলক মারার পূর্বেই আপনার কাছে এনে দিতে সক্ষম" (সূরা নমল, আয়াত ৪০)।

অতএব, একই মুহূর্তে তিনি সিরিয়াতেও উপস্থিত, আবার সাবা নগরীতেও উপস্থিত। এটা ছিল তাঁর কারামত শক্তি। নবীগণের মোজেযা শক্তি তো আরো বেশী শক্তিমান ও ব্যাপক। নবীগণ- বিশেষ করে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই মূহুর্তে কোটি কোটি মাইল দূরে একই সময়ে সর্বত্র হাযির ও নাযির হতে পারেন। এর ভুরি ভুরি বিশুদ্ধ প্রমাণ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান। তাই বলে কি তাঁরা ইলাহ্? যারা বলে- সর্বত্র হাযির নাযির হওয়া একমাত্র আল্লাহরই বৈশিষ্ট- তাহলে আসিফ বিন বরখিয়া, মালাকুত মউত- এমন কি খবিছ শয়তানকেও ইলাহ্ নামতে হবে। কেননা, তারাও তো একাধিক জায়গায় একসাথে হাযির

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

নাযির। (নাউযুবিল্লাহ)।

তৌহিদপন্থী দাবীদাররা তাদের পুস্তকসমূহে- "ইলাহ্" শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তা মানতে গেলে হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবতার চেয়ে আরো বেশী "ইলাহ্" মানতে হবে। প্রমাণিত হলো- নাযির নাযির হওয়াই "ইলাহ্" হওয়ার মূল ভিত্তি নয়।

৭। প্রসঙ্গ ঃ বিপদ দূর করা, হাজত পূর্ণ করা ও সাহায্য করা

যারা বলে- "তিনিই ইলাহ্- যিনি অনুবিধা দূরকারী, হাজতপূরণকারী ও একমাত্র সাহায্যকারী"। তাদের এই সংজ্ঞা সঠিক নয়। আল্লাহ্ পাক তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা ও তাঁদের তাবাররুক বা বরকতময় বস্তুকেও ঐসব ক্ষমতা দান করেছেন। কোরআন মজিদে তার প্রমাণ রয়েছে। যেমনঃ

ক) বিবি মরিয়মের হাতের স্পর্শে মৃত খেজুর গাছ জীবিত হলোঃ

পবিত্রা কুমারী হযরত মরিয়ম (আঃ) আল্লাহর হুকুমে যখন গর্ভবতী হলেন এবং প্রসবকাল ঘনিয়ে আসলো- তখন তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের নিজস্ব হুজরা ও লোকালয় ত্যাগ করে অনেক দূরে বায়তুল লাহাম (বেথেলহাম) নামক জঙ্গলে চলে গেলেন। সেখানে না ছিল কোন সাহায্যকারীনী ধাত্রী, না ছিল কোন মহিলা। তিনি একাকিনী বসে বসে ভাবছেন আর মনে মনে বলছেন- "হায়! আমি যদি প্রসবের পূর্বেই মরে যেতাম, আমি যদি মানুষের স্মৃতিপট থেকে একেবারে মুছে যেতাম" (সূরা মরিয়ম)। তাঁর এই আহাজারীতে আল্লাহর রহমতের দরিয়া উথলে উঠলো। এমন সময় বিবি মরিয়ম একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন-

"তাঁর নীচে থেকে আওয়াজ আসলো- হে মরিয়ম! চিন্তা করো না, তোমার প্রতিপালক তোমার কদমের নীচে একটি শীতল প্রস্রবন সৃষ্টি করে দিয়েছেন"। (সূরা মরিয়ম)।

এখানে "কদমের নীচে" শব্দ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে- এই পানির ঝরনা বিবি মরিয়মের কদমের উছিলায় উৎপন্ন হয়েছে- যেমন যমযমের পানি উৎপন্ন

হয়েছিল হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের কদমের আঘাতে। এরপর আল্লাহ পাক বিবি মরিয়মকে লক্ষ্য করে বললেন-

"এই মৃত খেজুর গাছের শুষ্ক ডালকে নীচের দিকে টান দাও- তাহলে দেখবে- তা থেকে অকস্মাৎ পাকা তাজা খেজুর ঝরে পড়ছে" (সূরা মরিয়ম)।

এভাবে তাঁর কদমের নীচের পানি পান করে ও হাতের পরশের খেজুর খেয়ে প্রসব ব্যথা কমে গেলো এবং সহজে হযরত ঈছা আলাইহিস সালাম ভূমিষ্ট হলেন। বুঝা গেল- বিবি মরিয়মের মত ওলীর কদমের ছোয়ায় গায়েবী পানি পাওয়া যায় এবং হাতের ছোয়ায় মরা বৃক্ষও জীবিত হয়ে ফলমূল দিতে পারে এবং সমূহ বিপদ ও কষ্ট লাঘব করতে পারে। তদ্রুপ ওলীগণের নজরে করমে মৃতবৎ আত্মা মারেফতের ফুলে ফলে সুসজ্জিত হতে পারে। এটা হলেই ইলাহ্ হয়ে যায় না।

খ) হযরত জিবরাঈলের ঘোড়ার খুরের মাটি দ্বারা খড়ের তৈরী বাছুরের মূর্তি জীবিত হলোঃ

কোরআন মজিদ বলে- ফেরাউন নীল দরিয়ায় নিমজ্জিত হওয়ার দিন হযরত জিবরাঈল (আঃ) একটি মাদি ঘোড়ার উপর আরোহী ছিলেন। জিবরাঈল (আঃ) মাদি ঘোড়াটি নিয়ে নীলনদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ফেরাউনের মরদ ঘোড়া জিবরাঈলের মাদি ঘোড়ার লোভে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। জিবরাঈলের ঘোটকী শুকনো পথে নদী পার হয়ে গেলো- আর ফেরাউনের ঘোড়া মাঝ নদীতে আসার সাথে সাথে দুই দিক থেকে পানি পর্বতসমান উঁচু হয়ে এসে ফেরাউনকে সসৈন্যে ডুবিয়ে মারলো।

হযরত মূছা (আঃ) -এর সাথী যাদুকর সামেরী হযরত জিবরাঈলের ঘোটকীর পায়ের খুড়ার নীচের সামান্য মাটি কুড়িয়ে নিলো। সে দেখেছিল- উক্ত ঘোটকীর খুড়ের পরশে মৃত ঘাস সাথে সাথে জীবিত হয়ে যাচ্ছে। সে ধারনা করলো- নিশ্চয়ই উক্ত মাটিতে জীবনের তাছির রয়েছে। হযরত মূছা আলাইহিস সালাম যখন তৌরাত কিতাব গ্রহণ করার জন্য চল্লিশ দিনের

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

চিল্লা নিয়ে তুর পর্বতে গমন করলেন -এই সুযোগে সামেরী খড় কুটা ও মাটি দিয়ে একটি বাছুরের মূর্তি তৈরী করে তার ভিতরে উক্ত ঘোটকীর খুড়ের কিছু মাটি ঢুকিয়ে দিলো। কি আশ্চর্য! সাথে সাথে উক্ত মূর্তিবাছুরটি জীবিত হয়ে গেলো। সামেরী হযরত মূছা (আঃ) -এর কওমের মধ্যে ঘোষণা করে দিলো- "এই বাছুরের ভিতরে খোদা লুকিয়ে আছে- তোমরা তার পূজা করো"। এভাবে অনেক লোক গো-পূজা শুরু করে দিলো। তখন থেকেই গো-পূজা শুরু হয়। হিন্দু জাতিরা তাই ভগবান জ্ঞানে গো-পূজা করে থাকে। সামেরীর এই গোবাছুর জীবিত করার ঘটনা কোরআন মজিদের সূরা তোয়াহা-তে আল্লাহ পাক কত সুন্দর করে বলেছেন-

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ-

অর্থাৎ- "সামেরী বললো- আমি জিবরাঈলের ঘোটকীর খুরের চিহ্নিত স্থান থেকে এক মুষ্ঠি মাটি নিয়ে নিলাম। অতঃপর তা এই মুর্তি বাছুরের মুখে ঢেলে দিলাম। আমার খবিছ অন্তর এভাবেই তা বলে দিয়েছিলো"। (সূরা তোয়াহা, ৯৬ আয়াত)।

উক্ত আয়াতের সারমর্ম হলো- "আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তগণের তাবাররুক বা বরকতময় বস্তু জীবনহীনকে জীবিত করতে পারে"। দেখুন! উক্ত মাটি ছিলো হযরত জিবরাঈলের ঘোটকীর খূরের তলার মাটি। ঐ মাটিতে প্রাণের তাছির কিভাবে আস্‌লো? হযরত জিবরাঈল (আঃ) -এর স্পর্শ থেকে ঐ তাছির এসেছিল। জিবরাঈল বসা ছিলেন কাঠের উপর। কাঠ লেগেছিল ঘোটকীর পিঠে, আর ঘোড়ার খুড় লেগেছিলো মাটির সাথে। সেই মাটি লেগেছিল মুর্তি বাছুরের মুখে। ঐ মাটিই বাছুরের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করেছিল। মাটি তো মৃত বাছুরের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে দিলো- কিন্তু ঐ বাছুরের হাম্বা আওয়াজ মানুষকে হেদায়াত করতে পারেনি -বরং গোমরাহীর বীজ বপন করেছিল। তদ্রুপ বেদ্বীন আলেমের সারগর্ভ (?) ওয়াজের দ্বারাও মানুষ হেদায়াত প্রাপ্ত হয়না -বরং আরো বেশী গোমরাহ্ হয়ে

যায়।

জিবরাঈলের ঘোড়ার খুড়ের মাটিতে যদি জীবনীশক্তি থাকে- তাহলে আল্লাহওয়ালাদের তাবাররুকে তাছির থাকবেনা কেন? দেখুন! মদিনা শরীফের মাটিকে "খাকে শেফা" বলা হয়। কেননা, উক্ত মাটি রোগ ও বালা মুসিবত বিদূরণকারী এবং আরোগ্যদানকারী। উক্ত মাটিতে এই তাছির কোথা থেকে আস্‌লো? যেহেতু মদিনা মোনাওয়ারার পবিত্র মাটি নবীজীর জুতা মোবারক চুমু খেয়েছিল, তাই তার মধ্যে এই তাছির এসেছে।

অতএব, মুসিবত দূর করাই যদি "ইলাহ্" হওয়ার শর্ত হয়- তাহলে খাকে শেফা এবং জিবরাঈলের ঘোড়ার খুড়ের মাটিও ইলাহ হওয়া উচিত। শুধু তাই নয় -বরং চিকিৎসকের টেবলেট ও সিরাপ, জঙ্গলের ঔষধিবৃক্ষ সমূহও ইলাহ হওয়ার যোগ্য হয়ে যাবে। বুঝা গেল- বিপদ দূরকারী, হাজত পূর্ণকারী ও সাহায্যকারী হলেই "ইলাহ্" হয় না- অথচ একশ্রেণীর নব্য ইসলামী চিন্তাবিদরা দাবী করছে- যিনি বিপদ দূর করেন, হাজত পূরণ করেন এবং সাহায্য করেন- একমাত্র তিনিই "ইলাহ্"। (নাউযুবিল্লাহ)।

৮। প্রসঙ্গ ঃ সৃষ্টি করা, মালিক হওয়া ও চিরস্থায়ী হওয়া "ইলাহ্" হওয়ার ভিত্তি নয়

মুসলমানদের মধ্যে কারো কারো ধারনা এই যে- "তিনিই ইলাহ্ বা আল্লাহ্- যিনি সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও চিরস্থায়ী। এসব গুণাবলী অন্য কারো মধ্যে নেই"। তাদের এ ধারণা ভুল। কেননা, সৃষ্টি করলেই খোদা হয়ে যায় না। মালিক হলেই "ইলাহ্" হতে হবে- এমন কোন কথা নেই। চিরস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হলেই খোদা হয় না। এসব গুণাবলী তো অন্যের মধ্যেও আছে। তবে কি তারা ইলাহ্?

বুঝা গেল- এইসব গুণাবলীকে ইলাহ্ হওয়ার একমাত্র ভিত্তি বা পরিধি মনে

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

করা সঠিক নয়। আল্লাহ পাক এসব গুণাবলীতে মৌলিকভাবে পূর্ণ গুণান্বিত- এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি এসব গুণাবলী তাঁর সৃষ্টি রাজীকেও দান করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই বলে তারা ইলাহ্ বা আল্লাহ্ হয়ে যান নি। যেমন-

ক) সৃষ্টি করা ঃ হযরত ঈছা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন-

اَنِّيْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ-

অর্থাৎ- "আমি মাটি দিয়ে পাখির সূরত সৃষ্টি করে তাতে ফুঁক দিলে সে আল্লাহর নির্দেশে জীবন্ত পাখী হয়ে যায়"। (সূরা আলে ইমরান, ৪৯ আয়াত)।

এখানে خلق শব্দটির কর্তা হচ্ছেন ঈছা আলাইহিস সালাম। তিনি বলেছিলেন- **"আমি পাখি সৃষ্টি করতে পারি"**। সৃষ্টি করাই যদি খোদার একমাত্র পরিচয় হয়- তাহলে তো ঈছা আলাইহিস সালামও স্রষ্টা হয়ে খোদা সাব্যস্থ হন- নাউযুবিল্লাহ্। কোরআন মজিদে স্বয়ং আল্লাহই ঐ خلق শব্দটি হযরত ঈছা আলাইহিস সালাম -এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

খ) মালিক হওয়া ঃ মালিক হতে হলে তাঁর গোলাম বা সৃষ্টি থাকতে হয়। যখন কোন সৃষ্টিই ছিলনা- তখন আল্লাহর মালিকত্ব গুণের প্রকাশও ছিলনা। কিন্তু তখনও তিনি ইলাহ্ ছিলেন। মালিকত্ব প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে তো মালিক বলা যায় না। বুঝা গেল- ইলাহ্ হওয়ার জন্য মালিক হওয়া জরুরী নয়।

গ) চিরস্থায়ী হওয়া ঃ আল্লাহ ছাড়াও চিরস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী বস্তু এবং বান্দা রয়েছে। বেহেস্তবাসীরা চিরস্থায়ী হবে এবং জান্নাতও চিরস্থায়ী। তাই বলে কি তারা ইলাহ? আল্লাহ পাক বেহেস্তবাসীকে চিরস্থায়ী বলেছেন।

যেমনঃ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا-

অর্থাৎ- "জান্নাতবাসীরা তথায় চিরস্থায়ী হবে"। (সূরা বাইয়েনাহ্)

তাওহীদপন্থী আলেমরা ওয়াযে বলে- "নেই কোন সৃষ্টিকর্তা- আল্লাহ ছাড়া", "নেই কোন সন্তানদাতা- আল্লাহ ছাড়া", "নেই কোন বিপদ দূরকারী- আল্লাহ ছাড়া", "নেই কোন হাজতপূরনকারী- আল্লাহ ছাড়া", "নেই কোন দাতা- আল্লাহ ছাড়া"।

একটি ঘটনা ঃ

এমন এক ওয়াযে এক হুযুরকে হাদীয়া দেননি আয়োজনকারীরা। হুযুর বাধ্য হয়ে হাদীয়া চাইলেন। তখন আয়োজনকারী বললেন- আপনিই তো বলেছেন- **"নেই কোন দাতা আল্লাহ ছাড়া"**। এখন আমার কাছে চান কেন? একমাত্র দাতার কাছেই চান। হুযুর তখন চুপ হয়ে গেলেন।

মূলকথা হলো- তারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কলেমার যেভাবে অর্থ করেন- তাকে অনেকটা অপব্যাখ্যাই বলা চলে। ইলাহ্ শব্দের প্রকৃত অর্থ কী- তা এখন জানা দরকার। (৮-এর মধ্যেই ১০টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে)।

"ইলাহ্" শব্দের প্রকৃত ইসলামী অর্থঃ

এবার আসা যাক- কালেমার মধ্যে ইলাহ্ শব্দের প্রকৃত অর্থ কী? ইলাহ্ শব্দের প্রকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে- اَللّٰهُ الصَّمَدُ

"ইলাহ্ তিনি- যিনি বে-নিয়ায বা অমুখাপেক্ষী"। তিনি সর্ব ক্ষেত্রেই কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন। ইলমে, জ্ঞানে, গুণে, ক্ষমতায়, শক্তিতে, পরিচালনায়, প্রয়োজন পূরণে, বিপদ দূরীকরণে, কর্তৃত্বে, স্থায়ীত্বে- এক কথায় সর্ববিষয়ে তিনি অমুখাপেক্ষী ও স্বয়ম্ভু। আর এসব বিষয়ে বান্দা হচ্ছে সর্ব ক্ষেত্রে তাঁর মুখাপেক্ষী। সূরা ইখলাছে বলা হয়েছে-

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

اَللّٰهُ الصَّمَدُ অর্থাৎ-" আল্লাহ সর্ব ক্ষেত্রে অমুখাপেক্ষী"।

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ অর্থাৎ- আল্লাহ্ কারো পিতা নন এবং কারো পুত্রও নন- তিনি সর্ব মুক্ত।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ অর্থাৎ- "তাঁর কোন সমকক্ষ নেই"। তিনি অন্যের সমকক্ষতা থেকে মুক্ত। কেননা, তিনি ছাড়া সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি অভাবমুক্ত। অন্যরা অভাবগ্রস্ত। ইলাহ্ তিনিই- যিনি সর্ব বিষয়ে অসীম ক্ষমতার অধিকারী -অন্যরা সসীম ও আল্লাহ্ নির্ভরশীল। সুতরাং **সূরা ইখলাস হলো ইলাহ্ শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা।**

وَاللّٰهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

"আল্লাহ সৃষ্টিজগত থেকে বেনিয়ায"। সৃষ্টির কাছে তাঁর কিছুরই প্রয়োজন নেই।

وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ -

অর্থাৎ-"আল্লাহ হচ্ছেন ধনী ও বে-নিয়ায- আর তোমরা হচ্ছো ফকির ও নিয়াযমন্দ"। কোরআন মজিদে আরো এরশাদ হয়েছে-

وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلِيًّا مِّنَ الذُّلِّ -

অর্থাৎ- "আল্লাহ তায়ালা নিজ হীনতার কারণে কাউকে অভিভাবক বানান নি"।

এসব আয়াত হচ্ছে- ইলাহ্ হওয়ার সঠিক মাপকাঠি- যার ভিত্তিতে বান্দা বান্দা থাকে এবং প্রভূ প্রভূ থাকেন। **বে-নিয়াযী ও প্রয়োজনমুক্ত হওয়াই "ইলাহ্" হওয়ার মূল ভিত্তি।**

অন্যান্য সিফাতী নাম আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে এককভাবে পার্থক্যকারী নয়। আল্লাহর অন্যান্য সিফাতী নাম বা গুণবাচক বিশেষ্য তাঁর পরিচয়ের একমাত্র ভিত্তি নয়। যেমন- কোরআন মজিদে আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে- وَاللّٰهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

অর্থাৎ- "আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা"।

আবার বান্দার পরিচয় দিতে গিয়েও একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

অর্থাৎ- "আমি(আল্লাহ) মানুষকে দ্রষ্টা ও শ্রোতা বানিয়েছি"। দেখুন- سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ এই দুইটি সিফাতী নাম আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে- অর্থাৎ- আল্লাহ দ্রষ্টা ও শ্রোতা এবং বান্দাও দ্রষ্টা এবং শ্রোতা। তাই বলে কি আল্লাহর সাথে শির্ক হয়ে গেলো? শির্ক যদি হয়ে থাকে -তাহলে আল্লাহর কালামকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে- اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّاهُوَالْحَيُّ الْقَيُّوْمُ-

"তিনিই ইলাহ্, তিনিই চিরজিন্দা, তিনিই চিরস্থায়ী"। আবার বান্দা সম্বন্ধেও একই حَيٌّ শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন- بَلْ اَحْيَاءٌ "শহীদগণ মৃত নন -বরং জিন্দা"। এতদসত্বেও আল্লাহ আল্লাহই রয়েছেন এবং বান্দা বান্দাই থেকে যাচ্ছেন। পার্থক্য শুধু বে-নিয়াযী ও নিয়াযমন্দি- অসীম ও সসীম।

ছামিউন, বাছিরুন, হাইয়ুন- ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত হওয়া স্বত্ত্বেও বান্দা ইলাহ্ হতে পারবেনা। কেননা, তারা বে-নেয়ায বা অমুখাপেক্ষী নয়। তারা আল্লাহর মুখাপেক্ষী ও নিয়াযমন্দ। **আল্লাহর উলুহিয়াত ও বান্দার আবদিয়াতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বিষয় হচ্ছে- হাকিকী ও মাজাযী, স্বত্বাগত এবং আল্লাহ প্রদত্ত।** এই পার্থক্য অনেকেই জানে না। জানলেও বলে না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- একই রেললাইনের উপর ইঞ্জিনও চলে এবং বগীও চলে। ইঞ্জিল চলে নিজ শক্তিতে- আর বগী চলে ইঞ্জিনের শক্তিতে। উভয়ই চলমান- কিন্তু ক্ষমতার ক্ষেত্রে ব্যবধান। তদ্রুপ- হাজতপূর্ণকারী, বিপদ দূরকারী, শেফা দানকারী, সন্তান দানকারী, বিশ্বজগতে কর্তৃত্বকারী,

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

দূর থেকে শ্রবণকারী- ইত্যাদি হাকিকী অর্থে আল্লাহ- কিন্তু মাজাযী অর্থে বান্দাও হতে পারে। বান্দা এসব গুণের অধিকারী হন অছিলা হিসাবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে। নবীগণের বেলায় এগুলোকে বলা হয় মোজেযা এবং অলীগণের বেলায় বলা হয় কারামত। সাধারণ মানুষের বেলায় বলা হয় মাজাযী। তাই বলে কি নবী ও অলীগণ ইলাহ্ হয়ে যান? না- তা কখনও হতে পারে না। নবীগণ এবং অলীগণ কখনও এমন দাবী করেন নি এবং করতেও পারেন না।

দেওবন্দী ওহাবীপন্থী ওলামাগণের পীর হাজী এমদাদুল্লাহ সাহেব তাঁর "যিয়াউল কুলুব" নামক তাসাউফ গ্রন্থের ২৯ ও ৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন-

"ফানা ফিল্লাহর মাকামে পৌঁছলে বান্দার মধ্যে খোদা প্রদত্ত বাতেনী শক্তি এসে যায়"। এটাকে তিনি খোদায়ী শক্তি বলেছেন। তিনি আরো লিখেছেন- "এমতাবস্থায় আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকেনা। তখন আল্লাহওয়ালা খাস বান্দা সৃষ্টি জগতে কর্তৃত্ব করতেও পারেন"। (যিয়াউল কুলুব- ফানা-র বর্ণনা অধ্যায়)।

আল্লাহর এসব বান্দা তখন মাজাযী অর্থে বা উছিলা অর্থে সন্তান দানকারী, হাজতপূরণকারী, বিপদ দূরকারী, শেফা দানকারী, দূর থেকে শ্রবণকারী- ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত হয়ে যান। তাই যারা ঐসব গুণাবলীকে একমাত্র ইলাহ্-র মানদন্ড সাব্যস্থ করেছেন- তারা মূলতঃ হাজার খোদাকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। এটা তাদের শেরেকী ধ্যান ধারনা।

আল্লাহ পাক-ই নবী ও অলীগণকে আপন যাত ও সিফাতের প্রকাশস্থল বানিয়েছেন। তাঁদের কর্মকান্ডের মাধ্যমেই আল্লাহর অসীম ক্ষমতা প্রকাশ পায়। আল্লাহর রহিমী সিফাত, নূরী সিফাত, কিব্‌রিয়ায়ী সিফাত, ক্ষমতা প্রয়োগকারী সিফাত, দূর হতে দেখা ও শুনার সিফাত- ইত্যাদি আমাদের প্রিয় নবীর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। তাই কুরআন মজিদে তাঁকে রাহিমুন, নূরুন, ছামীউন, বাছিরুন, শাহিদুন- ইত্যাদি সিফাতী নামে ভূষিত

করেছেন। তাই বলে কি প্রিয় নবীজি খোদা বা ইলাহ্ হয়ে গেছেন? নাউযুবিল্লাহ! রাহিমুন হওয়াই যদি ইলাহ্ হওয়ার মানদন্ড হয়- তাহলে আল্লাহর রাছুলকে কি বলবেন? নবীজির নামও তো রাউফুন- রাহিমুন। এই নাম তো আল্লাহ প্রদত্ত (সূরা তওবা)। কিন্তু দুই রাহীম শব্দের অর্থের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান।

আর একটি উদাহরণ- আগুনের মধ্যে লোহার দা ঢুকিয়ে দিলে কিছুক্ষণ পর লোহাটি আগুনের রূপ ধারণ করে এবং আগুনের মতই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। দহন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে তখন কি দা আগুন হয়ে যায়? না- আগুন হয় না, কিন্তু আগুনের গুণের সাময়িক অধিকারী হয়ে যায়। ইলাহ্ ও বান্দার উদাহরণও তদ্রুপ। আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হতে পারলে তাঁর মধ্যেও খোদায়ী সিফাত প্রকাশ পায়। তাই বলে বান্দা কখনও মাবুদ হয়ে যায় না। যারা ইহাকে শির্ক মনে করে- তারাই মূলতঃ মুশরিক। কারণ তাদের ধারণা মতে এসব গুণের অধিকারীকেই ইলাহ্ বা আল্লাহ বলা হয়। তারা কিতাব সম্পর্কে অজ্ঞ, হাকিকত ও মাজায সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, বালাগাত বা অলঙ্কার শাস্ত্র সম্পর্কে এরা একেবারেই মূর্খ।

ফিকাহ্ শাস্ত্র মতে ফতোয়া দিতে হলে হাকীকত ও মাজায সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। উরফ, আদত বা দেশাচার ও জনগনের পরিভাষা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতে হবে। এসব এলেম ও জ্ঞানের অভাবেই এরা কথায় কথায় শির্ক ও বিদআত বলে ফেলে। জনগণ তলিয়ে দেখেনা যে, শির্ক ও বিদআত বলে মূলতঃ জনগণকেই মুশরিক বানাচ্ছে।

মুসলমানকে মুশরিক বানাতে শয়তান নিরাশ হয়ে গেছে বলে নবীজি ইরশাদ করে গেছেন (বুখারী)। কাজেই আল্লাহর কুদরত, নবীগণের মোজেযা এবং অলীগণের কারামত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। নতুবা ঈমান বিনষ্ট হওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে। ফল কথা- আল্লাহ হলেন মূল ও স্বত্তাগত গুণের অধিকারী এবং বান্দা হলো আল্লাহ প্রদত্ত গুণের অধিকারী।

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

এ জন্যই বোখারী শরীফে অলী আল্লাহ্‌দের সম্পর্কে আল্লাহ পাক হাদীসে কুদসীতে এরশাদ করেন-

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يَبْصُرُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّذِيْ يَأْخُذُ بِهِ وَرِجْلَيْهِ الَّذِيْنِ يَمْشِيْ بِهِمَا- وَاِذَا سَأَلَنِيْ لَاُعْطِيَنَّهُ (بُخَارِيُّ)

অর্থঃ "নফল ইবাদতের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে বান্দা আমার বন্ধু হয়ে যায়। তখন আমি তার চোখ, কান, মুখ, হাত, পা হয়ে যাই- যদ্বারা সে দেখে, শুনে, ধরে এবং চলে। আর- যখন সে আমার কাছে কিছু চায়, আমি অবশ্য অবশ্যই তা দিই" (বুখারী)।

এ হাদীসের অর্থ এ নয় যে- আল্লাহ তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন এবং আল্লাহ ও বান্দা একাকার হয়ে গেছে -বরং এর মর্মবানী হচ্ছে- আল্লাহর তাজাল্লীয়ে রাব্বানী যখন বান্দার উপর পতিত হয়- তখন বান্দা থেকে খোদায়ী কাজ প্রকাশিত হতে থাকে। তখন বান্দা খোদায়ী শক্তির প্রকাশস্থল হয়ে যায়। তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ নিজ শক্তি প্রকাশ করেন। এটাকে ফানা ফিল্লাহর মাকাম বলা হয়।

একটি জিজ্ঞাসা ও তার উত্তর ঃ

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বিরুদ্ধবাদীরা সন্দেহ সৃষ্টির লক্ষ্যে একথা বলতে পারে যে- যদি বে-নেয়াযীই ইলাহ্-র একমাত্র মাপকাঠি হয়- তাহলে আরবের মুশরিকরাও তো তাদের দেবদেবীদেরকে বে-নিয়ায মনে করতো না -বরং আল্লাহর মুখাপেক্ষীই মনে করতো। এতদসত্বেও তাদের দেবদেবীদেরকে কেন ইলাহ্ বলা হলো এবং তাদেরকেই বা কেন মুশরিক বলা হলো?

দেবদেবী সম্পর্কে তাদের আক্বিদা ও বিশ্বাস ছিল- "আমাদের মাবুদ সমূহ

(দেবদেবী) অদৃশ্য জ্ঞানী, সর্বত্র বিরাজমান, দূর হতে শ্রবণকারী,হাজত পূরণকারী, বিপদ দূরকারী ও ফরিয়াদ গ্রহণকারী"। এসব আক্বিদার কারণেই তারা মুশরিক বলে সাব্যস্থ হয়েছে- কারণ এসব গুণাবলী উলুহিয়তের পরিধিভুক্ত। যে বান্দার মধ্যে এসব গুণাবলী মানা হয়- তাকে খোদা বলেই স্বীকার করা হয়। মুশরিকরা এসব গুণাবলী তাদের দেবদেবীর মধ্যে আরোপ করে মুশরিক হয়েছে। আজকের মুসলমানরাও নবী এবং অলীগণের মধ্যে ঐসব গুণাবলী স্বীকার করে মুশরিক হবে না- কেন? তারা তো তাদের পীর বুযুর্গ এবং নবীকে এসব গুণাবলীর অধিকারী দাবী করে প্রকৃতপক্ষে ইলাহ্ বলেই স্বীকার করে নিচ্ছে। সুতরাং এই আক্বিদা শিরিকী আক্বিদা।

জবাব ঃ

ওহাবীপন্থী ও মউদূদী পন্থীদের এটা চূড়ান্ত আঘাত- যার উপর ভিত্তি করে তারা সাধারণ মুসলমানকে বিভ্রান্ত করছে এবং তাদেরকে মুশরিক বলে বিভিন্ন মাহফিলে বক্তব্য রাখছে। তাদের এই বিভ্রান্তির জবাব হচ্ছে-

"শিরক হচ্ছে- কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বা বরাবর স্বীকার করা"। যেমন, কোরআন মজিদে কাফেরদের ব্যাপারে এরশাদ হয়েছে-

ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ -

অর্থাৎ- "কাফেররা বান্দাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের সমকক্ষ মনে করে"।

অন্য আয়াতে এরশাদ হচ্ছে- اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

অর্থাৎ- "কিয়ামত দিবসে কাফেররা স্বীয় উপাস্য দেব- দেবীদেরকে লক্ষ্য করে বলবে- "আমরা তোমাদেরকে রাব্বুল আলামীন -এর সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করতাম"। -বুঝা গেল যে, কোন সৃষ্টিকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করাই শিরক। মুশরিকরা তাই মনে করতো। কোন মুসলমানই এরূপ মনে করেনা।

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সমকক্ষতা দুই ভাবে হতে পারে। (এক) সৃষ্টিকে আল্লাহর ন্যায় সমকক্ষ স্থান দিয়ে স্বত্বাগতভাবে (যাতি) সৃষ্টিকর্তা, মালিক, অদৃশ্যজ্ঞানী, রক্ষক, সর্বত্র বিরাজমান- ইত্যাদি মনে করা। (দুই) মহান আল্লাহর শান ক্ষুন্ন করে বান্দার সমান মনে করা এবং এ কথা বিশ্বাস করা যে, কিছু জিনিসের জন্য বান্দা আল্লাহর মুখাপেক্ষী- আর কিছু জিনিসের জন্য আল্লাহ বান্দার মুখাপেক্ষী। **এই দুই অবস্থায় বান্দাকে আল্লাহর বরাবর মনে করার নাম শিরিক। আরবের কাফিরগণ এই দুই প্রকারের শিরিকেই লিপ্ত ছিল। সুতরাং বিরুদ্ধবাদীদের দাবী ঠিক নয়।**

একদল বলতো- ভাল ও মন্দের স্রষ্ঠা দুইজন। ভাল- এর স্রষ্ঠার নাম "ইয়াজদান" এবং মন্দ -এর স্রষ্ঠার নাম "আহরেমান"। উভয় স্রষ্ঠাই সমকক্ষ। হিন্দুরা মানে তিন স্বত্বা- যথাঃ ব্রম্ম, বিষ্ণু ও শিব। ব্রম্ম হলেন স্রষ্ঠা, বিষ্ণু হলেন পালনকর্তা এবং শিব হলেন সংহারকর্তা। আরবের একদল মুশরিক বলতো- ফিরিস্তা ও দেবদেবীরা আল্লাহর পুত্র সন্তান। আর একদল বলতো- দেবদেবীরা আল্লাহর কন্যাসন্তান। এসব মুশরিকরা দেবদেবীদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করেই বিপদ দূরকারী, হাজত পূর্ণকারী- ইত্যাদি "সত্ত্বাগত সমকক্ষ" হওয়ার আক্বিদা পোষণ করার কারণেই মুশরিক হয়েছে।

আর একদল বলতো- আমাদের দেবদেবী ও মূর্তিগুলো আল্লাহর বান্দা বটে- কিন্তু মহান প্রভূ তাদের মুখাপেক্ষী। মহান প্রভূ বিশ্বভূমন্ডল সৃষ্টি করে এতবেশী দূর্বল ও কাহিল হয়ে পড়েছেন যে, দুনিয়ার পরিচালনা ও এন্তেযাম নিজ আয়ত্বে রাখতে অক্ষম। তাই আমাদের উপাস্য দেব-দেবীদের উপর পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। এখন তারাই এখানকার কাজকর্ম চালাচ্ছেন। তাদের এই আক্বিদা হচ্ছে শিরক। তারা আল্লাহকে বে-নিয়ায মনে করছেনা। তাদের মতে আল্লাহ পরনির্ভরশীল এবং তাদের দেবদেবীরা আল্লাহর সমকক্ষ ক্ষমতার অধিকারী। তাদের শিরিকের ইহাই মূল কারণ। তাদের মতবাদ খন্ডন করে আল্লাহ্ পাক

এরশাদ করেছেন- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ "তিনি কারো পিতা নন এবং সন্তানও নন"। আরো এরশাদ করেন- وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ

অর্থাৎ-"জগত সৃষ্টি ও পালনের ক্ষেত্রে আমাকে দূর্বলতা স্পর্শ করতে পারেনি"। অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেন-

وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلِيًّا مِّنَ الذُّلِّ -

অর্থাৎ- "আল্লাহ তায়ালা অসহায় ও দূর্বল হয়ে কাউকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেন নি"। **উপরে উল্লেখিত আক্বিদার কারণেই তাদেরকে মুশরিক বলা হয়েছে।**

আলহামদু লিল্লাহ! কোন মুসলমান এরূপ জঘণ্য আক্বিদা পোষণ করেনা। আল্লাহর প্রিয় নবীকে আল্লাহ প্রদত্ত ইলমে গায়েবের অধিকারী স্বীকার করা, কোন মাহবুব বান্দাকে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সৃষ্টির রক্ষক, বিপদ দূরকারী, হাজতপূর্ণকারী- ইত্যাদি মনে করা শিরিকও নয়- কুফরীও নয়। মুসলমানের আক্বিদা হচ্ছে আল্লাহনির্ভর এবং মুশরিকদের আক্বিদা হচ্ছে স্বনির্ভর। উভয়ের আক্বিদার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

যারা মুসলমানদের আক্বিদাকে মুশরিকদের আক্বিদার সাথে তুলনা করে- তারাই বরং মুশরিক। কেননা, তারা বান্দাকে খোদার সমকক্ষ বানিয়ে ফতোয়াবাজী করে। ইসলামী আইন ব্যাখ্যা করলে তারা এরূপ বলতে পারতো না। কাফের ও মুশরিকদের শানে নাযিলকৃত আয়াতকে তারা অলী আল্লাহ্দের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। তারা কোরআনের অপব্যাখ্যাকারী।

সাহাবাগণ রাসুল (দঃ)কে কেমন মনে করতেন?

(১) এখন দেখা যাক- সাহাবায়ে কেরাম রাসুল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেমন মনে করতেন? তাঁরা রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তাঁদের হাজত পূরণকারী, বিপদ দূরকারী ও রক্ষক বলে বিশ্বাস করতেন। যখন তাঁদের

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে যেতো- তখন নবীজীর দরবারে এসে আরয করতেন- طَهِّرْنِيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

অর্থাৎ- "হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আমাকে ত্রুটি বিচ্যুতি হতে পাক পবিত্র করে দিন"।

তাঁরা কেন একথা বলতেন? তাঁরা স্বয়ং কুরআন মজিদে দেখেছেন, আল্লাহ পাক বলছেন- وَيُزَكِّيْهِمْ "আমার প্রিয় হাবীব তাদের অপবিত্রতা দূর করেন" (সূরা বাকারা, ১২৯ আয়াত)। এই অপবিত্রতা দূরকারী ও পবিত্রকারী হচ্ছেন আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ্পাক তাঁকে মুযাক্কী বা পবিত্রকারী খেতাবে ভূষিত করেছেন।

(২) আরও দেখুন- সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের সমস্ত ধন-সম্পদ দান ও সদকা করার মানসে হুযুর পূরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দরবারে হাযির হলে আল্লাহ পাক উক্ত সদকা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করে এরশাদ করেন-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ-

"হে আমার হাবীব! আপনি তাদের মালের সদকা গ্রহণ করুন এবং এর মাধ্যমে তাদের যাহের বাতেন পবিত্র করুন এবং তাদের জন্য রহমত প্রার্থনা করুন- নিশ্চয়ই আপনার রহমত কামনা তাদের মনের প্রশান্তি এনে দিবে" (সূরা তাওবা, ১০৩ আয়াত)।

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো- শুধু নামায, রোযা ও কোরআন হাদীস আমাদেরকে পাক পবিত্র করতে পারেনা- যতক্ষণ না মাহ্বুবে খোদার সুদৃষ্টি হয়। কোরআন হাদীস হচ্ছে সাবান ও পানি স্বরূপ- আর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দোয়া, দয়া ও রূহানী সাহায্য হচ্ছে পরিপূর্ণ পবিত্রতার উছিলা। শুধু সাবান আর পানি দিয়ে কাপড় পরিপূর্ণ

সাফ হয় না- হাতও লাগাতে হয়। নবীজির নজরে করম হচ্ছে পরিপূর্ণ পবিত্রতার উছিলা।

(৩) আরও দেখুন- অন্ধরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর শরনাপন্ন হয়ে দৃষ্টি শক্তি প্রার্থনা করেছেন, মৃগ রোগীরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরোগ্য প্রার্থনা করেছেন, উস্তুনে হান্নানা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জান্নাত প্রার্থনা করেছিল। খাদেম সাহাবী হযরত রাবিয়া ইবনে কা'ব (রাঃ) হুযুরের নিকট জান্নাতে তাঁর সান্নিধ্য প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু দোজাহানের শাহিনশাহ একথা বলেন নি যে, শেফা দানকারী, দৃষ্টিশক্তি দানকারী, জান্নাত দানকারী একমাত্র আল্লাহ- আমি কিভাবে দেবো? বরঞ্চ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের সে হাজত পূরণ করেছেন। বুঝা গেল- খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাহিদা ও হাজত পূরণ করে থাকেন। যদি নবীজিকে ইলমে গায়েবের অধিকারী স্বীকার করা, রক্ষক মনে করা, বিপদ দূরকারী ও হাজত পূরনকারী মনে করা শিরিক হয়- তাহলে সাহাবায়ে কেরাম সবাই মুশরিক হয়ে যেতেন- (নাউযুবিল্লাহ!)

আম্বিয়ায়ে কেরামের খোদাপ্রদত্ত ইলমে গায়েব, হাযির নাযির, মুশকিল-কোশা, হাজাত রাওয়া- ইত্যাদি এমন সুস্পষ্ট বিষয়- যা এ যুগের কাফিররাও অস্বীকার করতে পারবে না- অথচ মুসলমান নামধারী কিছু সংখ্যক তা অস্বীকার করছে।

(৪) দেখুন- বিপদে আপদে নবীর কাছে গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করার কথা কোরআন মজিদে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন ফিরাউন ও তার অনুসারীদের উপর আল্লাহর কোন গযব নেমে আসতো- তখন ফিরাউন হযরত মূছা (আঃ)-এর নিকট গিয়ে এভাবে প্রার্থনা করতো-

لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ-

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অর্থাৎ- "হে মূছা! আপনি যদি এবার আমাদের উপর থেকে খোদায়ী আযাব দূর করে দিতে পারেন- তাহলে আমরা অবশ্যই আপনার উপর ঈমান আনবো এবং বনী ইসরাঈলকে আপনার সাথে পাঠিয়ে দেবো"। (সূরা আ'রাফ, ১৩৪ আয়াত)।

দেখুন! আল্লাহ বা মূছা আলাইহিস সালাম নবীর কাছে তাদের এই ফরিয়াদ ও প্রার্থনাকে শিরিক বলেন নি -বরং মূছা (আঃ) দোয়ার মাধ্যমে তাদের বিপদ দূর করে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তাদের এই প্রার্থনা যদি শিরিক হতো- তাহলে বিপদ দূর না করে ডাবল আযাবের ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় ছিল।

আল্লাহ বলেন কী- আর ওহাবী মোল্লা বলে কী!

পরিতাপের বিষয়- এ যুগের কিছু কলেমাগো তথাকথিত বাতিলপন্থী মৌলভীরা নবীদের নিকট বিপদ দূর করার প্রার্থনাকে শিরিক বলে বিভেদ সৃষ্টি করে চলেছে।

সার কথা হলো- হাজত পূরন, বিপদ দূরীকরণ, রোগ থেকে মূক্ত করন- এগুলো মৌলিকও স্বত্বাগতভাবে আল্লাহর কাজ এবং উছিলা হিসাবে নবী, রাসুল ও অলী আল্লাহগণের কাজ। <u>এই মাসআলার সূত্র ও ভিত্তি হচ্ছে হাকীকত ও মাজাযের উপর। আলেম মাত্রই হাকীকত ও মাযাযের মাসআলা সম্পর্কে অবগত আছেন।</u> এটা না বুঝা পর্যন্ত ঈমানই সঠিক হবে না। সত্যপথ অনুসরণ করাই বিবেকবানের কাজ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ
রাসুল
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ-

প্রথম অধ্যায়ে ইলাহ্ বা আল্লাহর পরিচয় দেয়া হয়েছে এবং উলুহিয়াতের

ভিত্তি কিসের উপর তা বর্ণনা করা হয়েছে। এবার আসুন রাসুল সম্পর্কে। কালেমা তাইয়েবা -এর দু'টি অংশ। একটি অংশ হলো- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এবং অপর অংশ হলো- مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রথমটি হচ্ছে তাওহীদের অংশ এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে রিসালাতের অংশ। তাওহীদ ও রিসালাত উভয় অংশের সম্মিলিত নাম ঈমান- অর্থাৎ- তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাসের নামই ঈমান। তাওহীদ ও রিসালাতের গুরুত্বের কারণেই তা একসাথে মিশে কালাম না হয়ে কালেমা হয়েছে।

<u>এখন গবেষণার বিষয় হচ্ছে- রিসালাত অর্থ কী এবং রাসুল কে হয়ে থাকেন? রিসালাতের ভিত্তি ও স্থিতি কী?</u>

স্মরণ রাখা দরকার যে- রিসালাত ও বি'ছাত উভয় শব্দের অর্থই প্রেরণ করা। কিন্তু গুণগত দিক দিয়ে উভয় শব্দের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। 'বি'ছাত' বলা হয় সাধারণ প্রেরণ করা এবং রিসালাত বলা হয় কিছু দিয়ে প্রেরণ করা। কাজেই 'রিসালাত' শব্দটি নবীদের জন্য খাস। কিন্তু 'বি'ছাত' হচ্ছে আম বা সাধারণভাবে প্রেরণ করা। মোজাদ্দেদগণের বেলায়ও বি'ছাত বলা হয়েছে। (হাদীস)।

রাসুল শব্দের সংক্ষিপ্ত শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- প্রেরিত সংবাদদাতা ও ফয়েযদাতা। রাসুল দুই প্রকারের- যথাঃ (১) বে-ইখতিয়ার রাসুল বা ক্ষমতাহীন রাসুল (২) বা- ইখতিয়ার রাসুল বা ক্ষমতাবান রাসুল। ক্ষমতাহীন রাসুল হচ্ছে কতিপয় ফিরিস্তা। জিবরাইল আলাইহিস সালাম হচ্ছেন তাঁদের সরদার। আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজিদে বে-ইখতিয়ার রাসুল উপাধীধারী ফিরিস্তাদের কথা সূরা ফাতির -এর ১নং আয়াতের মধ্যে এভাবে উল্লেখ করেছেন-

جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ-

অর্থাৎ- "আল্লাহ তায়ালা অনেক ফিরিস্তাকে পাখা বিশিষ্ট রাসুল বা

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বার্তাবাহক বানিয়েছেন"। (সূরা ফাতির)।

অপরদিকে মানবজাতির মধ্য থেকে "বা-ইখতিয়ার রাসুল" বা ক্ষমতাবান রাসুল বানিয়েছেন আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামগণকে। ইনিরা ফিরিস্তা রাসুল হতে উত্তম। ফিরিস্তা রাসুল শুধু বাণী বহন করে নিয়ে আসে- কিন্তু তা বাস্তবায়ন করতে পারেনা। অপরদিকে- মানুষ রাসুলগণ উক্ত বাণীর নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে পারেন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে- যেমন বাদশাহর প্রশাসনিক নির্দেশ। তিনি বাহকের মাধ্যমে তা মন্ত্রীবর্গের নিকট পৌছিয়ে থাকেন। বাহক শুধু নির্দেশনামা পৌছিয়ে দেয়- কিন্তু তা কার্যকরী করেন মন্ত্রীবর্গ। মন্ত্রীবর্গ উক্ত নির্দেশ বাদশাহ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাস্তবায়িত করেন। উক্ত আইন মান্যকারীকে তারা পুরস্কৃত করেন এবং অমান্যকারীকে শাস্তি প্রদানও করতে পারেন।

জনসাধারণের প্রতি বাদশাহর নির্দেশনামা বাহক এবং মন্ত্রী- উভয়ের মাধ্যমেই পৌছে সত্য- কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বাহক হচ্ছে বে-ইখতিয়ার বা ক্ষমতাহীন- কিন্তু মন্ত্রীবর্গ হচ্ছেন বা ইখতিয়ার বা ক্ষমতাবান। বাহক হচ্ছে কর্মচারী- আর মন্ত্রীবর্গ হচ্ছেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা। বাহককে বলা হয় খাদেম- কিন্তু মন্ত্রীবর্গকে বলা হয় প্রশাসক। মন্ত্রীর আনুগত্য করা আবশ্যকীয়- কিন্তু বাহকের আনুগত্য করা আবশ্যকীয় নয়। মন্ত্রীর আনুগত্য করলে তা বাদশাহর আনুগত্য বলেই গণ্য হয়। মন্ত্রীর আনুগত্য না করলে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায় এবং তা বাদশাহর প্রতিও বিদ্রোহ বলে গণ্য হয়। মন্ত্রীদেরকে প্রয়োজনবোধে শাস্তি দেয়ার ক্ষমতাও প্রদান করা হয়- কিন্তু নির্দেশ বহনকারীকে সে ধরনের ক্ষমতা দেয়া হয় না।

বুঝার সুবিধার জন্য উপরোক্ত উদাহরণ দেয়া হলো। অনুরূপভাবে- ফিরিস্তা রাসুলগণ শুধু আল্লাহর বাণী ও নির্দেশ নবীগণের খেদমতে পৌছিয়ে দেয়ার অধিকারী -এর বেশী নয়। এজন্য আল্লাহর বাণীবাহক রাসুল হওয়া সত্ত্বেও

ফিরিস্তাদের কোন উম্মত নেই। তাঁরা নবীগণের খাদেম স্বরূপ। আল্লাহর কোন নির্দেশ প্রয়োগ করার ক্ষমতা তাঁদের নেই এবং কালেমায়ও তাঁদের নাম সংযোজিত হয় না। জিবরাঈল, মিকাইল ও ইস্রাফীল রাসুল সত্য- কিন্তু তাঁদের উম্মত নেই।

অপরদিকে আম্বিয়ায়ে কেরামের মর্যাদা হচ্ছে শাসকের মর্যাদা। উনিরা মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হাকিম স্বরূপ। এজন্যই উম্মতের উপর তাঁদের নির্দেশ প্রয়োগ করা হয় এবং তাঁদের নামের কালেমাও পাঠ করতে হয়। এটা হচ্ছে আনুগত্যের শপথ নামা। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন হাকিম (সূরা নিসা, ৬৫ আয়াত)

ক্ষমতাবান রাসুল এবং ক্ষমতাহীন রাসুলের মধ্যকার এইসব পার্থক্য স্মরণে রাখা সবারই কর্তব্য। তা না হলে বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকিয়ে যাবে এবং উল্টা-পাল্টা কথা মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে।

আম্বিয়ায়ে কেরাম যদি ক্ষমতাহীন হন- তাহলে রিসালাতে মোহাম্মদী এবং রিসালাতে জিবরাইলের মধ্যে পার্থক্য থাকলো কোথায়? আমরা "মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" কালেমা পড়ি- কিন্তু "জিবরাঈলু রাসুলুল্লাহ" পড়িনা কেন? ঐ ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীন হওয়ার কারণেই একটি পড়ি- অন্যটি পড়িনা। রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আনুগত্য ও অনুসরণ করা ফরয- কিন্তু রাসুল জিবরাঈলের আনুগত্য ও অনুসরন করা ফরয নয়। এর একটি প্রমাণ দেখুন!

হাদীসে জিবরাঈল ঃ

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আন্হু বর্ণিত বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে জিবরাঈলে আছে- তিনি বলেন- "একদিন আমরা রাসুলে পাকের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তির উদয় হলো- যাঁর পোষাক ছিল ধবধবে সাদা এবং চুল ছিল কুঁচকুঁচে কালো। ভ্রমনকারীর কোন আলামতই

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তাঁর মধ্যে ছিল না- অথচ আমরা তাঁকে চিনতেও পারছিলাম না। তিনি আমাদের পরিচিতও ছিলেন না। তিনি দো জানু হয়ে আদবের সাথে শিষ্যের মত নামাযের বৈঠকের সূরতে হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে নিজের হাঁটুর উপর হাত রেখে বসে গেলেন। অতঃপর হুযুরের খেদমতে পাঁচটি প্রশ্ন রাখলেন। এ পাঁচটি প্রশ্ন হলো- (১) ইসলাম কী? (২) ঈমান কী? (৩) ইহ্সান বা ইখলাস কী? (৪) কিয়ামত কখন হবে? (৫) কিয়ামতের আলামত কী?

রাসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগন্তুকের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন এবং আগন্তুক প্রত্যেক উত্তরের জবাবে বললেন- "আপনি সত্য এবং সঠিক বলেছেন- সঠিক বলেছেন"। এরপর হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এ ঘটনার কিছু দিন পরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- "হে ওমর! ইনি ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। তিনি (আমার মাধ্যমে) তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন" (সংক্ষিপ্ত হাদীস)।

-দেখুন, জিবরাঈল (আঃ) মানব সূরতে এসে সরাসরি সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে একথা বলেন নি যে, আমি জিবরাঈল (আঃ) -তোমাদেরকে এসব মাসআলা শিক্ষা দিতে এসেছি- তোমরা আমার থেকে শিখে নাও। -বরং রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দরবারে সাগরিদের বেশে আদবের সাথে বসে প্রশ্ন করে তার জবাব নবীজীর জবানে বয়ান করালেন। এ রকম করলেন কেন? এ জন্যই এরূপ করেছেন যে- মানুষের উপর তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করা ফরয ছিলনা -বরং নবীজির কথা মানাই ফরয। তিনি দরবারে রিসালাতের মর্যাদা এবং আদবও শিক্ষা দিয়ে গেলেন তাঁর আচরনের মাধ্যমে। তিনি একথা শিক্ষা দিলেন- তিনিও একজন খাদেম ও উম্মত। এটাই হচ্ছে বা- ইখতিয়ার ও বে-ইখতিয়ার রাসুলের মধ্যেকার পার্থক্য। কিছু লোক আজকাল আম্বিয়ায়ে কেরামকে

"সম্পূর্ণ দূর্বল বান্দা ও ক্ষমতাহীন সংবাদ বাহক" বলে আখ্যায়িত করছে এবং প্রমাণ স্বরূপ একটি ফার্সী কবিতা আওড়াচ্ছে-

مصطفے هرگز نه گفتے تانه گفتے جبرائیل-
جبرائیل هرگزنه گفتے تانه گفتےکردگار-

অর্থাৎ- "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও বলতেন না- যতক্ষণ না জিবরাঈল (আঃ) বলতো; এবং জিবরাঈলও বলতো না- যতক্ষণ না আল্লাহ্ তায়ালা বলতেন"।

তারা একথার ভুল ব্যাখ্যা করে বলছে- "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন জিবরাঈল (আঃ) -এর মুখাপেক্ষী আর জিবরাঈল (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহর মুখাপেক্ষী। রাসুল সম্পূর্ণ অক্ষম" (নাউযুবিল্লাহ)। প্রকৃত মর্ম হচ্ছে- "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু বলতেন- তা ছিল ওহী সঞ্জাত- ওহীর বাইরে নয়"। (সূরা আন-নজ্ম)।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

রাসুলের ক্ষমতা

এবার দেখুন- রাসুল সক্ষম- না অক্ষম?

১। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন-

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ -

অর্থাৎ- "প্রেরিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাহেরী ও বাতেনী সব ধরনের অপবিত্রতা থেকে লোকদেরকে পাক পবিত্র করেন এবং তাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও নবীর হিকমত (হাদিস) শিক্ষা দেন"। (সূরা জুমুয়া)।

-বুঝা গেল- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষমতাহীন বা

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অক্ষম নন -বরং ক্ষমতাবান ও পাক পবিত্র করতে সক্ষম। অক্ষম হলে এরূপ করতে পারতেন না।

২। সূরা তাওবা ১০৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا-

"হে মাহবুব! আপনি তাদের মালামালের সদকা বা যাকাত গ্রহণ করে তাদেরকে যাহেরী ও বাতেনী অপবিত্রতা থেকে পাক পবিত্র করুন"।

বুঝা গেল- তিনি মানুষকে পাক পবিত্র করতে সক্ষম।

৩। সূরা আহযাব ৫১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ

"হে রাসুল! আপনি আপনার বিবিগণের মধ্যে যাকে চান- বিবাহ বন্ধনে রাখুন- আর যাঁকে চান আপনার থেকে পৃথক করে দিন"।

প্রতিয়মান হলো- বিবিগণকে রাখা না রাখার ব্যাপারে তিনি আল্লাহ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

৪। সূরা আহযাব ৩৬ নম্বর আয়াতে এরশাদ হচ্ছে-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ-

অর্থাৎ- "যখন আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন বিষয়ে ফয়সালা দেন- তখন কোন মুমিন নর অথবা মুমিন নারীর দ্বিমত পোষণ করার কোনই ইখতিয়ার নেই"।

বুঝা গেল– রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফয়সালা দিতে সক্ষম এবং তাঁর সামনে উম্মতরা অক্ষম বা ক্ষমতাহীন।

৫। সূরা নিছা ৬৫ নম্বর আয়াতে এরশাদ হয়েছে-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

"হে প্রিয় হাবীব! আপনার রবের শপথ। এই লোকেরা ততক্ষণ পর্যন্ত মোমেন হতে পারবেনা- যতক্ষণ না তাদের বিবাদে আপনাকে **একচ্ছত্র ক্ষমতাবান বিচারক স্বীকার করবে** এবং আপনার ফয়সালা মানতে তাদের হৃদয়ে সংকীর্ণতা না থাকবে- বরঞ্চ তারা অবনত মস্তকে তা স্বীকার করে নিবে"।

-অত্র আয়াতেই প্রমাণিত হলো যে- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপরাধ মূলক বিচারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও ক্ষমতাবান শাসক। উম্মতের উপর তিনি ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। যারা বলে- তিনি ছিলেন শুধু আল্লাহর বার্তা বাহক- তাদের মতে তিনি অক্ষম ও দূর্বল। ইসমাঈল দেহ্লভী তো বলেই ফেলেছে যে- "যার নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- সে কোন কিছুর মালিক ও মোখতার নন"। (তাকভিয়াতুল ঈমান)।

উপরে উল্লেখিত ৫টি আয়াতই প্রমাণ করে যে, তিনি দূর্বল ও অক্ষম নন; তিনি শুধু বার্তা বাহক নন -বরং তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাসুল। ফিরিস্তা রাসুল এই ক্ষমতার অধিকারী নয়- তারা শুধু বার্তা বহন করে নবীগণের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়- প্রয়োগ করার ক্ষমতা তাঁদের নেই।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

রাসুল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ হচ্ছেন অরূপ আর বান্দা হচ্ছে স্বরূপ। অরূপ ও স্বরূপের মধ্যে মিলন খুবই কঠিন। তার জন্য প্রয়োজন সেতুবন্ধ। আল্লাহ হচ্ছেন অসীম আর বান্দা হচ্ছে সসীম। অসীম আর সসীমের মিলনও খুবই জটিল। তাই এমন এক মধ্যসত্ত্বার প্রয়োজন- যাঁর একদিক রয়েছে অসীমের দিকে, অপর

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

দিক রয়েছে সসীমের দিকে। অসীম ও অরূপ থেকে কিছু ফয়েয নিতে হলে মাধ্যম প্রয়োজন। বান্দার সাথে লেনদেনের জন্যই আল্লাহপাক অন্য প্রিয় বান্দাকে নির্বাচন করেন- তাঁদের মাধ্যমেই ঈমান দেন, নামায দেন, রোযা দেন, হজ্ব দেন, যাকাত দেন, শরিয়তের বিধি বিধান দেন- এক কথায় ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রদান করেন। আম্বিয়ায়ে কেরাম হচ্ছেন আল্লাহ প্রদত্ত ফয়যে এলাহী প্রাপ্তির একমাত্র মাধ্যম। এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা। তাই নবী ও রাসুলগণ হচ্ছেন মহামানব ও অতিমানব বা সুপারম্যান। তাঁদের মধ্যে যেমনি রয়েছে মানবীয় গুণাবলীর সমাবেশ- তেমনিভাবে মালাকী ও হ'ক্কী গুণাবলীরও সমাবেশ। তাঁদের মধ্যে কখনও প্রকাশ পায় অতিমানবীয় গুণাবলী। তাই তাঁরা অন্যান্য মানুষের মত নন- যদিও সূরতে ও আকৃতিতে মানব জাতিই বটে। (রুহুল বয়ান)।

নবীগনের মধ্যে বাশারী, মালাকী ও হক্কী গুণাবলীর সমাবেশ স্বীকার না করলে তাঁদের শানমান খাটো করা হয়- যা ঈমানের পরিপন্থী। বিষয়টি বাস্তব হলেও অতি দূর্বোধ্য এবং জটিল। তাই কিছু লোক বাহ্যিক আচরন দেখে আমাদের প্রিয় নবীকে তাদের মত সাধারণ মানুষ বলে গন্য করে। তাঁর অপর দুইটি দিক সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন তোলে। এক ব্যক্তি বলেছে- তিনি শুধু বশর- আর কিছু নন। জ্ঞানের অপ্রতুলতাও গভীরতার অভাবেই এরূপ বলতে পারে।

রাসুল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তার আলোচনা করতে গিয়ে উপরের ভূমিকার অবতারনা না করে উপায় ছিলনা। কেননা, রাসুলগনকে কিছু দিয়েই প্রেরণ করা হয় -তা বান্দাকে দেয়ার জন্য। বান্দার সাথে আল্লাহর সেতুবন্ধন রচনা করার জন্য রাসুলগণ হচ্ছেন মাধ্যম।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- একটি মানব দেহে রূহ, ক্বলব বা হৃৎপিন্ড, শিরা, রগ ও বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে। তার মধ্যে রূহ হচ্ছে হায়াতের মূল। এই রূহ মানবদেহকে প্রতিপালিত করে- ক্বলব বা হৃৎপিন্ডের মাধ্যমে। ক্বলব বা হৃৎপিন্ড রক্ত সঞ্চালন করে রগ ও শিরার মাধ্যমে।

আবার রগ ও শিরা রক্ত সঞ্চালন করে দেহের প্রতিটি অঙ্গে।

এখন দেখা যাচ্ছে- রগ ও শিরার মাধ্যমে ক্বলব বা হৃৎপিন্ড হতে দেহ রক্ত গ্রহণ করে। আবার হৃৎপিন্ড বা ক্বলব সতেজ ও সচল থাকে রূহের মাধ্যমে। দেহ, রগ, ক্বলব বা হৃৎপিন্ড এবং রূহ -এই বস্তু চতুষ্টয় এক জিনিস নয়। এগুলোর মধ্যে রূহ হচ্ছে হুকুমদাতা, ক্বলব হচ্ছে যোগানদাতা, রগ ও শিরা হচ্ছে বহণকারী এবং দেহ হচ্ছে গ্রহণকারী। মূল দাতা রূহ এবং গ্রহীতা দেহের মধ্যখানে ক্বলব, রগ ও শিরার যেই অবস্থান- ঠিক আল্লাহ ও বান্দার মধ্যখানে রাসুলগণের এবং অলীগণেরও সেই অবস্থান।

এবার আসুন আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সম্পর্কের কথায়। আল্লাহ অতি দূরে, ধরা ছোয়ার বাইরে। আল্লাহ হচ্ছেন নূর আর বান্দা হচ্ছে অন্ধকার। আল্লাহ শক্তির আঁধার, বান্দা হচ্ছে দূর্বল। আল্লাহ ফয়েয দাতা, বান্দা ফয়েয গ্রহীতা। তাই আব্‌দ ও মা'বুদ, খালেক ও মাখলুক, রব ও বান্দা, মোহতাজ ও বে-নিয়ায -এর মধ্যখানে এমন এক মাধ্যমের প্রয়োজন- যিনি প্রভূ হতে ফয়েয নিতে পারেন এবং বান্দাকে দিতে পারেন। রূহের ফয়েয যেমন প্রথমে যায় ক্বলবে- তারপর রগও শিরায়, তারপর যায় দেহে- তদ্রুপ আল্লাহর যাবতীয় ফয়যে এলাহী প্রথমে বর্ষিত হয় আম্বিয়ায়ে কেরামের উপর, তারপর নবীজীর সাহাবী ও আউলিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে- অন্যান্য বান্দার উপর বর্ষিত হয়। আগুনের তাপ প্রথমে লাগে তাওয়ার গায়ে, তারপর লাগে রুটিতে। সরাসরি রুটির গায়ে আগুন লাগলে রুটি পুড়ে যায়। আল্লাহর তাজাল্লী সরাসরি তূর পাহাড়ে পড়েছিল বলেই তো তূর পাহাড় জ্বলে গিয়েছিল। আল্লাহ হচ্ছেন আগুন স্বরূপ, নবী হচ্ছেন তাওয়া স্বরূপ এবং আমরা হচ্ছি রুটি স্বরূপ।

এটা বুঝার জন্য উদাহরন মাত্র। নতুবা আল্লাহর শান কত উর্দ্ধে, নবীজীর শানও কত উর্দ্ধে। তাই কোন বান্দা রব পর্যন্ত পৌঁছাতে হলে বা তাঁর থেকে কিছু পেতে হলে অবশ্যই রাসুলের প্রয়োজন হয়। কেননা, রাসুল হচ্ছেন সিড়ি স্বরূপ। সিড়ি বেয়েই দোতালায় এবং উপরে উঠতে হয়। রাসুলের

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

একদিক হচ্ছে মানুষের দিকে- অপর দিক হচ্ছে আল্লাহর দিকে। তিনি এক হাতে আল্লাহর থেকে আনেন- অন্য হাতে বান্দাদেরকে দান করেন। এজন্যই বুখারী শরীফের হাদীসে আছে- নবীজী ফরমান-

وَاللّٰهُ يُعْطِيْ وَ اَنَا الْقَاسِمُ-

"আল্লাহ হচ্ছেন দাতা আর আমি হলাম বন্টনকারী"। দুনিয়ার সংকট থেকে উদ্ধার পেতে হলে নবীজীর দামান (আঁচল) ধরতে হবে। এদিকে ইশারা করেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন-

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَاتَفَرَّقُوْا-

"তোমরা আল্লাহর রশিকে (নবীকে) মযবুত করে আঁকড়ে ধরো এবং এই রশি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না"। (সূরা নিসা, ১০৩ আয়াত)।

কবি আল্লামা ইকবাল বলেছেন-

کی وفا تونے محمد سے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح وقلم تیرے ہیں-

"তুমি যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ওয়াফাদার গোলাম হতে পারো- তাহলে আমিও তোমার পক্ষে আছি। এই পৃথিবী কোন্ ছার- তখন লওহ-কলমও তোমার হবে"। (জওয়াবে শিক্ওয়া)।

কত গভীর দর্শনের কথা এটি। কোরআন মজিদের ঐ আয়াতেরই কাব্যিক ব্যাখ্যা হচ্ছে ইকবালের এটি- যে আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

"বলুন হে প্রিয় হাবীব! তোমরা যদি আল্লাহর ভালবাসা পেতে চাও- তাহলে আমার অনুসরণ করো- তাবেদারী করো। তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন"। (সূরা আলে ইমরান, ৩১ আয়াত)।

কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন-

"ঐ নামেরি রশি ধরে- যেতে হবে খোদারি ঘরে,
নদী তরঙ্গে পড়েছে যে ভাই- সাগরেতে আপনে মিশে"।

কুপের নীচে থাকে কাঁদা ও ময়লা। তার উপরে থাকে স্বচ্ছ পানি। বালতিতে রশি বেঁধে স্বচ্ছ পানি তুলতে হয়। সেই পানিই পান করার যোগ্য। কাঁদা ও ময়লা তুলে আনলে সেই পানি হয় অপেয়। তদ্রুপ এই পৃথিবীও একটি গভীর কূপের ন্যায়। এখানে যেমন আছে সঠিক আক্বিদা ও নেক আমল স্বরূপ স্বচ্ছ পানি, তেমনিভাবে আছে খারাপ আক্বিদা ও খারাপ আমল স্বরূপ কাঁদাযুক্ত ময়লা পানি। স্বচ্ছ পানি পান করা যায়- চাষাবাদ করা যায়- কিন্তু ময়লাযুক্ত পানি- না পান করার উপযুক্ত- না চাষাবাদের উপযুক্ত। তদ্রুপ ঈমান আক্বিদার স্বচ্ছ পানি দ্বারাও আখেরাতের চাষাবাদ হয় এবং বেঈমানির ময়লা পানি দ্বারা আখেরাতের ক্ষেতি বরবাদ হয়ে যায়। এই রশি ধরেই খোদার ঘরে যেতে হবে। এরই নাম হচ্ছে "হাবলুল্লাহিল মাতীন" বা মজবুত রশি। যে এই রশি ও দামানকে ধরেছে, সে আল্লাহর হাতকেই আঁকড়ে ধরেছে। তাই কোরআন পাকে ঘোষণা হয়েছে-

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ- يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ-

"নিশ্চয়ই যারা আপনার কাছে বাইআত গ্রহণ করে, সে আল্লাহর কাছেই বাইআত গ্রহণ করে। তাদের হাতের উপর রয়েছে আল্লাহর কুদ্রতের হাত" (সূরা আল-ফাতাহ, ১০ আয়াত)।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

বাইআতের হাকীকত

সাহাবীগণ নবীজির কাছে বাইআত গ্রহণ করার সময় হুযুর সাল্লাল্লাহু

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের হাতের উপর নিজ পবিত্র হাত রাখতেন। এদিকে ইঙ্গিত করেই অত্র আয়াত নাযিল হয়েছে। এখানে রাসুলের হাতকে আল্লাহ নিজের কুদ্‌রতের হাত বলেছেন। এতেই আল্লাহর সাথে নবীজীর ঘনিষ্ট সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়।

উক্ত আয়াত মর্মে একথারও প্রমাণ পাওয়া যায়- যারা মুর্শিদের হাতে বাইআত গ্রহণ করে- তারা প্রকৃতপক্ষে নবীজির হাতেই বাইআত গ্রহণ করে। সুতরাং প্রমাণিত হলো- নবীজির হাতে বাইআত করলে এই বাইআত বাইআতুল্লাহ হয়। আর মুর্শিদের হাতে বাইআত করলে এই বাইআতে শেখ-ই বাইআতুর রাসুল হয়। ইহাকেই আরবীতে বলা হয় "বি-ওয়াছিতাতে খোলাফায়িহি" বা রাসুলের প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে রাসুলের বাইআত। আল্লাহর প্রতিনিধি হলেন রাসুল এবং রাসুলের প্রতিনিধি হলেন শেখ বা পীর। প্রতিনিধির কাছে বাইআত গ্রহণ করলে ইহাই মালিকের বাইআত বলে গন্য হয়। (প্রমাণ তাফসীরে রুহুল বয়ান ও তাফসীরে সাভী - উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা)।

বাইআতের হাকীকত হলো- "আল্লাহও রাসুলের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা"। ইহা একটি শক্ত রশির ন্যায়- যার এক মাথা রাসুলের হাতে, অপর মাথা আল্লাহর হাতে। অনুরূপভাবে মুর্শিদের হাতে থাকে নিম্ন মাথা এবং রাসুলের হাতে থাকে উপরের মাথা। ইহাকে সিলসিলা বা শিকলের কড়া বলা হয়। পীরের বাইআত, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর আনুগত্যের বাইআত ও রাসুলে পাকের বাইআত মূলতঃ আল্লাহরই বাইআত (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ও তাফসীরে সাভী, ২৬ পারা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা)।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

রিসালাতে বিশ্বাস করার ৩টি শর্ত

রিসালাতের উপর বিশ্বাস করার জন্য তিনটি বিষয় স্বীকার করা অত্যাবশ্যকীয়ঃ

(১) স্বীকার করতে হবে- আমরা সোজাসোজি মহান আল্লাহ থেকে কোন নেয়ামত গ্রহণ করতে পারিনা। যা কিছু আল্লাহর পক্ষ হতে মিলে- তা রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মাধ্যমেই মিলে। কেননা, তা না হলে রাসুল প্রেরণই অর্থহীন হয়ে পড়বে এবং প্রতিনিধিত্বের কোন গুরুত্বই থাকবেনা। আমরা হচ্ছি গ্রহীতা- আর রাসুল হচ্ছেন সেই দানের মাধ্যম বা বন্টনকারী এবং আল্লাহ হচ্ছেন দাতা (বুখারী শরীফ)।

রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমেই অন্য দেশের সাহায্য আসে।

(২) রিসালাতে বিশ্বাস করার জন্য দ্বিতীয় শর্ত হলো- একথা স্বীকার করা যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মত অসহায় ও কর্তৃত্বহীন নন। তিনি বিশ্বজগতে কর্তৃত্বের ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তিনি রব থেকে নিতে পারেন এবং আমাদেরকে দিতে পারেন। তিনি যদি রব থেকে সরাসরি নিতে না পারেন- তাহলে তাঁর জন্য আরেকজন রাসুলের প্রয়োজন হবে। তখন তাঁকে আরেকজনের উম্মত হতে হবে। এটা অবাস্তব।

(৩) একথাও স্বীকার করতে হবে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাতা রবকে যেমন ভালভাবে জানেন ও চিনেন- তেমনিভাবে গ্রহীতা উম্মতকেও জানেনও চিনেন। হাদীসে তার অসংখ্য প্রমাণ আছে। উভয়দিকের জ্ঞান না থাকলে নেওয়া ও দেওয়া প্রমাণিত হয়না।

যেসব লোক সরাসরি এবং কোন মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ থেকে সবকিছু পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করে- তারা মূলতঃ রিসালাতকেই অমান্য করে। তারা কালেমা তাইয়েবার দ্বিতীয় অংশ- "মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ"-এর অস্বীকারকারী। কেননা, রাসুল হলেন আল্লাহর প্রতিনিধি। প্রতিনিধির মাধ্যম ছাড়া কোন কিছু পাওয়ার ধারনা বাতুলতা বৈ আর কিছুই নয়। বান্দা যদি সরাসরি সবকিছু পেয়ে যায়- তাহলে রাসুলের প্রয়োজনীয়তা থাকে কোথায়?

এতে পরিষ্কার হয়ে গেলো- আল্লাহর সাথে রাসুলের সম্পর্ক হলো গ্রহণ করার এবং আমাদের সাথে রাসুলের সম্পর্ক হলো প্রদান করার। এই

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

কথাটুকু বুঝানোর জন্যই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমরা বলি- (رَسُوْلَ اللّٰهِ) অর্থাৎ আল্লাহর রাসুল এবং আরো বলি- (رَسُوْلَنَا) অর্থাৎ- আমাদেরও রাসুল। তিনি আল্লাহ হতে গ্রহণ করেন বলে "রাসুলুল্লাহ" এবং আমাদেরকে দান করেন বলে "রাসুলুনা"। কোরআন মজিদে আল্লাহর রাসুল (رَسُوْلَ اللّٰهِ) এবং তোমাদের রাসুল (رَسُوْلُكُمْ) উভয় শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং তিনি আল্লাহরও রাসুল এবং আমাদেরও রাসুল। এই হাকিকত উপলব্ধির নামই প্রকৃত ঈমান।

সপ্তম অধ্যায় ঃ
রাসুলের মর্যাদা

এই পৃথিবীতে আমরাও আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছি এবং রাসুলও আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন। কিন্তু আমাদের প্রেরণকে বলা হয়েছে "খাল্‌ক" বা সৃষ্টি এবং রাসুলের প্রেরণকে বলা হয়েছে "ইরছাল" ও "বাআছ"- বা প্রেরণ। এই দুইয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইবাদত করা এবং রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইবাদত শিক্ষা দেয়া ও অন্যান্য ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করা।

বুঝা গেল- আমরা হলাম সাধারণ মাখলুক- কিন্তু রাসুল হলেন খোদাপ্রদত্ত দায়িত্ব পালনকারী মহান মাখলুক। আমরা আগমন করি নিজ দায়িত্বে কিন্তু রাসুলের আগমন হয় আল্লাহর দায়িত্বে ও জিম্মায়।

উদাহরণ স্বরূপ- বিদেশে কেউ যায় নিজ খরচে, আবার কেউ যায় সরকারী খরচে সরকারী প্রতিনিধি হয়ে। এই দুই গমনের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। সরকারী প্রতিনিধির সমস্ত কার্যকলাপ রাষ্ট্রের কার্যকলাপ বলে গন্য হয়- কিন্তু নিজ খরচে ভ্রমণকারীর বেলায় তা গন্য হয় না।

আমরা এসেছি মোমিন হওয়ার জন্য- কিন্তু রাসুল এসেছেন মুমিন বানানোর জন্য। মানব সমাজ রাসুলের মাধ্যমেই মোমেন ও মোত্তাকী হয়। আমরা

জাহাজে চড়ি যাত্রী হিসাবে- কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চড়েন কাপ্তান বা পরিচালক হিসাবে। আমরা এক বন্দর হতে অন্য বন্দরে পৌছি- কিন্তু রাসুল আমাদেরকে তথায় পৌছিয়ে দেন। একারণেই যাত্রীরা ভাড়া দেয় এবং কাপ্তান সরকারী ভাতা নেয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কান্ডারীর দায়িত্ব পালন করেছেন বলেই আল্লাহ পাক তাঁর জন্য রেখেছেন বেশুমার প্রতিদান (সূরা নুন, ৪ আয়াত)। আমরা জন্ম গ্রহণ করার অনেকদিন পর শিক্ষা গ্রহণ করি এবং অপরজন হতে শিখি- কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেই কলেমা এবং নামায শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা সামাজিক কালিমাযুক্ত- কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ কালিমামুক্ত। পরিবেশ আমাদেরকে পরিবর্তন করে- কিন্তু রাসুল পরিবেশকে পরিবর্তন করেন। এজন্যই হযরত ঈছা আলাইহিস সালাম ভূমিষ্ট হয়ে বলেছিলেন-

إِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا وَّجَعَلَنِيْ مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَاَوْصَانِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا- وَبَرًّا بِوَالِدَتِيْ-

অর্থাৎ- "আমি আল্লাহর মহান বান্দা! আমাকে তিনি (ইঞ্জিল) কিতাব দিয়েছেন। আমাকে নবুয়ত দান করেছেন। আমাকে বরকতময় করেছেন- যেখানেই থাকিনা কেন। আমাকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন- যতদিন জীবিত থাকি এবং আমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন" (সূরা মরিয়ম, ৩০ আয়াত)।

-উক্ত আয়াতে সবগুলি ক্রিয়াই অতীতকালের- অর্থাৎ- সব কিছু শিখে এবং জেনে শুনেই ইছা আলাইহিস সালাম এখানে এসেছেন।

এটাই হচ্ছে রাসুলের প্রকৃত শান ও মর্যাদা। রাসুল জন্মসূত্রেই "আরিফ বিল্লাহ" হয়ে আসেন। আর আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভূমিষ্ট হয়েই তাওহীদ ও নিজ রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সিজদা করে দুনিয়াতে এসেছিলেন - যা নামাযের মগজ। শিশুকালেই তিনি ইনসাফ কায়েম করেছিলেন। তিনি দুধ-মাতা হালিমার একদিকের স্তন হতে দুধ পান করতেন এবং অন্যস্তন দুধশরিক ভাই আবদুল্লাহর জন্য রেখে দিতেন। দু'বৎসর পূর্ণ হতেই তিনি দুধপান ছেড়েছিলেন। এই শিক্ষা তিনি কোথায় শিখেছিলেন? এই হলো আমাদের ও রাসুলের মধ্যে পার্থক্য।

যেসব লোক রাসুলগণকে নিজেদের মত সাধারণ মনে করে এবং মন্তব্য করে- নবুয়ত ব্যাপারে তাঁরা পূর্বে অবগত ছিলেন না কিংবা নবুয়তের দায়িত্ব লাভ করার পূর্বে তাঁরা অজ্ঞ, পথভ্রষ্ট ছিলেন- তারা পশুতুল্য। আমরা শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী- কিন্তু রাসুলগণ কারো মুখাপেক্ষী নন- বরং খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান নিয়েই তাঁরা দুনিয়াতে আসেন। ইহাই রাসুলগণের শান ও মর্যাদা।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে- "পবিত্র জীবন যাপনকারী ব্যক্তিই সফলকাম"। প্রশ্ন হলো- এই পবিত্রতা শিক্ষা দেন কে? পবিত্রতা দানকারী কে? তার উত্তর স্বয়ং কোরআনেই পাওয়া যায়- "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে পবিত্র করেন" (وَيُزَكِّيهِمْ)।

-বুঝা গেল- পবিত্রতা অর্জনকারী হলাম আমরা- আর পবিত্রতা দানকারী হলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ইহাই রাসুলের শান ও মর্যাদা।

অষ্টম অধ্যায় ঃ

রাসুল হলেন আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম

মানবদেহে ৪টি বস্তু রয়েছে। যথাঃ (১) দেহ (২) উপশিরা (৩) ক্বলব (৪) রূহ বা আত্মা। ক্বলব শরীরে রক্ত সঞ্চালন করে শিরা উপশিরার মাধ্যমে- আবার ক্বলবকে পরিচালনা করে রূহ। তদ্রুপ আল্লাহ তায়ালা রাসুলে পাকের মাধ্যমে আমাদেরকে চারটি জিনিস দান করেছেন। (১) শরিয়ত (২) তরিকত (৩) হাকীকত (৪) মারেফাত। শরীয়ত দ্বারা তিনি আমাদের

শরীর পাক করার শিক্ষা দিয়েছেন। তরিকত দ্বারা আমাদের চিন্তা চেতনা পবিত্র করেছেন। হাকীকত দ্বারা পাক করেছেন ক্বলবকে এবং মারেফাত দ্বারা পাক করেছেন আত্মাকে। এই জন্য এক বর্ণনায় এসেছে-

اَلشَّرِيْعَةُ اَقْوَالِيْ- وَالطَّرِيْقَةُ اَفْعَالِيْ- وَالْحَقِيْقَةُ اَحْوَالِيْ- وَالْمَعْرِفَةُ اَسْرَارِيْ-

অর্থাৎ- "শরিয়ত আমার বাণী, তরিকত আমার কার্যাবলী, হাকীকত আমার বিশেষ হাল (ঐশী উন্মাদনা) এবং মারেফাত আমার গুপ্ত রহস্য"।

এটা জানা একান্ত প্রয়োজন- শরিয়তের কেন্দ্র হলো নবী মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জবান মোবারক। তরিকতের কেন্দ্র হলো নবীজীর -সিনা মোবারক। হাকীকতের কেন্দ্র হলো নবীজির রূহ মোবারক। মারেফাতের কেন্দ্র হলো নবীজির গোপন ভেদ বা হাকীকতে মোহাম্মদীর তত্বজ্ঞান।

আমাদের দেহে নফসে আম্মারা নামক একটি কুপ্রবৃত্তি রয়েছে। এটাকে পানি দ্বারা পাক করা যায় না। এটাকে পাক করা যায় একমাত্র এশ্‌কে রাসুল বা হুব্বে রাসুল দ্বারা।

সৃষ্টির জন্য রাসুলের এত বেশী প্রয়োজন- যেমন প্রয়োজন মৃত জমীনের জন্য বৃষ্টির। জমির কোন অংশই যেমন পানিমুক্ত হতে পারে না- তেমনিভাবে আমাদের হায়াত, মউত, কবর, হাশর, নশর- সবকিছুই রাসুল বিহীন অবস্থায় থাকতে পারেনা। ইহজগত ও পরজগতে রাসুল ছাড়া গতি নেই। কবরে রাসুল সম্পর্কে পরীক্ষা হবে। হাশরে রাসুলের সুপারিশেই বিচার অনুষ্ঠান শুরু হবে। দোজখীরা রাসুলের সুপারিশে নাজাত পাবে। বেহেস্তীরা রাসুলের সুপারিশে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। ৪৯০ কোটি লোক শুধু রাসুলের সুপারিশেই বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (হাদিকাতুন নাদিয়া- আল্লামা আবদুল গণী নাবলূছী)।

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

নবম অধ্যায় ঃ

একটি সংশয়

উপরের বক্তব্যের উপর কারো প্রশ্ন হতে পারে যে- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিনা মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহর নিকট হতে সব কিছু লাভ করতে পারেন- তাহলে জিবরাঈলের প্রয়োজন হলো কেন? এখানে তো দেখা যায়- ওহীর ক্ষেত্রে হযরত জিবরাঈলকে আল্লাহ পাক মাধ্যম বানিয়েছেন। বুঝা গেল- মানব রাসুলগণ জিবরাঈল নামক ফেরেস্তা রাসুলের মুখাপেক্ষী ছিলেন। (ওহাবী ও মউদূদীবাদীদের দাবী)।

জবাব

রাসুলে পাকের দরবারে জিবরাঈলের আগমন ছিল একটি কানুন বা নিয়মের অনুসরণ মাত্র। রাসুলে পাকের দরবারে ফিরিস্তার এই আগমন হুযুরের এলেমের জন্য ছিল না। আল্লাহ পাক প্রথমেই সব কিছু শিক্ষা দিয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। **আল্লাহ কর্তৃক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রথমেই "তালীম" দেয়া হয়েছে- কিন্তু "নুযুল বা তানযীল" হয়েছে পরে।** শরিয়তের বিধি বিধান নবীজীর পূর্ব এলেম -এর উপর নির্ভরশীল নয় -বরং তানযীলের উপরই শরিয়তের বিধি বিধান নির্ভরশীল। মোদ্দা কথায়- রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েই তাশরীফ এনেছেন- কিন্তু ঐসব শিক্ষা বাস্তবায়ন হয়েছে ফেরেস্তাকর্তৃক নুযুল বা তানযীলের মাধ্যমে। এটা অতি সুক্ষ্ম বিষয়। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা- শরিয়তের বিধি-বিধান ঐ সময় চালু হবে- যখন জিবরাঈলের মাধ্যমে তা প্রেরণ করা হবে। এর স্বপক্ষে কয়েকটি দলীল রয়েছে। যেমন-

১। আল্লাহ পাক সূরা আররাহমান-এ এরশাদ করেছেন-

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ-

"তিনিই রহমান- যিনি শিক্ষা দিয়েছেন -আল কুরআন"।

এখানে ফেল, ফায়েল ও একটি মাফউল উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য একটি মাফউল (রাসুল) উহ্য রয়েছে। কেননা, বাবে তাফঈলের দুইটি মাফউল হওয়া বাধ্যতামূলক। সেই উহ্য মাফউলটি হলো "মোহাম্মাদান"। অর্থাৎ- "তিনিই রহমান- যিনি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিক্ষা দিয়েছেন আল কুরআন"।

অত্র আয়াতে عَلَّمَ শব্দটির কর্তা হচ্ছেন আল্লাহ। ইহা সাধারণ অতীত কাল (مَاضِيْ مُطْلَقْ) বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে- যার অর্থ "সুদূর অতীতকালে আল্লাহ্ তাঁকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন"। তাইতো আমাদের প্রিয় নবী জন্ম হয়েই নামায আদায় করেছেন এবং কালেমা শাহাদাত পাঠ করেছেন। (খাসায়েসে কুবরা- আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি)।

অথচ কালেমা পরে নাযিল হয়েছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ৪০ বৎসর বয়সে- আর নামাযের বিধান নাযিল হয়েছিল শবে মি'রাজে- যখন হুযুরের বয়স ছিল সাড়ে ৫১ বৎসর। কোরআন নাযিলের বহু পূর্বে তিনি কালেমা ও নামায শিখলেন কখন? বুঝা গেল- তিনি ঐসব আল্লাহ হতেই শিখে এসেছেন- জিবরাঈলের (আঃ) মাধ্যমে নয়।

(২) আল্লাহ পাক কোরআন সম্পর্কে এরশাদ করেছেন- هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ- এই কোরআন মুত্তাকীনদের জন্য পথ প্রদর্শনকারী। হুযুরের জন্য পথ প্রদর্শনকারী হলে বলা হতো هُدًى لَّكَ অর্থাৎ- আপনার জন্য পথ প্রদর্শনকারী। প্রকৃত পক্ষে নবীগণের পথ প্রদর্শনকারী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ- -কুরআন নয়।

(৩) জিবরাঈলের মাধ্যমে কোরআন নাযিলের পূর্বে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত হুযুরের জিন্দেগী ছিলো সততা, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, সরলতা ও মানবসেবার অতি উত্তম আদর্শ। ফলে কাফেরগণও তাঁকে আল-আমীন ও সাদিকুল ওয়াদ (অঙ্গীকার রক্ষাকারী) লকবে ভূষিত করেছিল। হুযুরের

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

হেদায়াতপ্রাপ্তির শিক্ষা যদি কোরআন নাযিলের উপর নির্ভরশীল হতো -তা হলে হয়তো অন্যান্য আরবদের মতই হতো তাঁর জীবন। (নাউযুবিল্লাহ)।

এবার বলুন- এসব হেদায়াত বা গুণাবলী তিনি কোন্ ফেরেস্তার মাধ্যমে পেয়েছিলেন?

(৪) প্রথম অহী নাযিলের পূর্বে ছয় মাস যাবৎ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেরা গুহায় ই'তিকাফ, নামায, রুকু-সিজদা, মোরাকাবা, মোশাহাদা- ইত্যাদি ইবাদতে মশগুল ছিলেন। কে তাঁকে এসব শিক্ষা দিয়েছিলেন?

(৫) নামায ফরয হয় মি'রাজ রজনীতে সরাসরি আল্লাহর দরবারে। মি'রাজে যাওয়ার পথে বাইতুল মোকাদ্দাসে তিনি সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের ইমাম হয়ে নামায আদায় করেছিলেন। হযরত জিবরাঈল ছিলেন মোয়ায্যিন -আর নবীগণের মধ্যে হয়েছিলেন মুকাব্বির।

বলুন- এই নামায কে শিক্ষা দিয়েছিলেন- জিবরাঈল- নাকি আল্লাহ? নামায পড়াতে হলে ইমামতির নিয়ম কানুন আগে শিখতে হয়। তাঁর পিছনে এমন সব অভিজ্ঞ মোক্তাদী ছিলেন- যাঁরা পূর্বে ইমামতি করে নিজ নিজ উম্মতকে নামায পড়াতেন। এমন সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ নবীগণের ইমামতি করা চাট্টিখানি কথা নয়। নামায সম্পর্কে ইমামকে মোক্তাদী থেকে বেশী মাসআলা জানতে হয়। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কার নিকট থেকে এসব মাসআলা শিখেছিলেন এবং কখন শিখেছিলেন? উত্তর নিষ্প্রয়োজন- তারাই বলুক।

৬। অহী সাত প্রকার। সব অহী জিবরাঈলের মাধ্যমে নাযিল হয়নি। শুধু কোরআন নাযিল হয়েছে জিবরাঈলের মাধ্যমে। কিন্তু এর মর্মবাণী সবগুলো জিবরাঈলও জানতোনা। সূরা মরিয়মের শুরুতে حٰمٓ عٓسٓقٓ -এই খন্ড হরফগুলো যখন জিবরাঈল (আঃ) পাঠ করছিলেন- তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন- (عَلِمْتُ) "আমি পূর্বেই

এর মর্ম জেনেছি" (রূহুল বয়ান)।

বুঝা গেল- আয়াত নাযিল হয়েছে জিবরাঈলের মাধ্যমে - কিন্তু মর্মবাণী ইল্কা হয়েছে সরাসরি আল্লাহর পক্ষ হতে (তাফসীরে রুহুল বয়ান)।

কোন কোন অহী জিবরাঈল ছাড়াই অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেন-

ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى-

অর্থাৎ- "আমার বন্ধু নিকট থেকে আরো নিকটে আসলেন- যেমন দুটি তীরের মুখামুখী -বরং তার চেয়েও কাছে। অতঃপর আল্লাহ আপন প্রিয় বান্দার প্রতি গোপন অহী নাযিল করলেন"। (সূরা আন-নজ্‌ম, ৮-১০ আয়াত)।

এখানে সরাসরি ওহী নাযিলের উল্লেখ রয়েছে- যার খবর জিবরাঈলও জানেন না। (মতান্তরে ৯০ হাজার কালাম)।

দশম অধ্যায় ঃ

নবী (দঃ)

নবী ও রাসুল দু'টি পরিভাষা। নবী অর্থ গোপন বিষয়ের সংবাদদাতা- আর রাসুল অর্থ- আল্লাহ কর্তৃক নূতন বিধান বহনকারী প্রতিনিধি। ইসলামে নবুয়তের মর্যাদা ও তার অবস্থান অতি উচ্চে। ঈমানের পূর্বশর্ত হলো রিসালাতে বিশ্বাস। তিনি যা নিয়ে এসেছেন- তার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখা। শরহে আকায়েদে নছফীতে ঈমানের সংজ্ঞা এভাবে উল্লেখ আছে-

اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ بِمَاجَاءَ بِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ-"ঈমানের সংজ্ঞা হলো- নবীকে এভাবে বিশ্বাস করা যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন- তা সত্য"।

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

এখানে প্রথমেই নবীর সত্যতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে। তারপর আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নিযুক্তি ও তাঁর উপর অর্পিত বিষয়াবলীর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করাকেই ঈমান বলা হয়েছে। এই ঈমানই হলো মুক্তির পূর্বশর্ত। শুধু তাওহীদে বিশ্বাসের নাম ঈমান নয়। তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাসের নামই ঈমান। এর ওপরই মুক্তি ও জান্নাতলাভ নির্ভরশীল। তাওহীদী জনতা যে কোন আস্তিকের বেলায় প্রযোজ্য- কিন্তু ইসলামে শুধু তাওহীদের নাম ঈমান নয় -বরং "মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ"-এর নাম ঈমান। কেননা, এখানে প্রথমে রাসুল ও পরে আল্লাহ রয়েছে।

বুঝা গেল- আল্লাহর সাথে রাসুলের সংযোগ না হলে ঈমান হয় না। সব কিছু বিশ্বাস করা সত্ত্বেও যদি নবীর ওপর বিশ্বাস না করে, তাহলে সে মু'মিন হবেনা -বরং কাফের হবে। তার অনেক উদাহরণ ও দলীল রয়েছে। যথাঃ-

(১) শয়তান খোদার যাত ও সিফাত, ফিরিস্তা, কিতাব, আখেরাত, অদৃষ্ট বা তকদীর, মৃত্যুর পর পূনরুত্থান- ইত্যাদি ৬টি বিষয়ের ওপর বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু বিশ্বাসী ছিলনা আদম নবীর নবুয়তের ওপর। তাই তার গলায় লা'নতের শিকল পড়েছিল। সে নিজেই কিয়ামত স্বীকার করে বলেছিল-

رَبِّ فَانْظِرْنِيْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ –

"হে আমার রব! আমাকে পূনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সময় দাও" (সূরা ছোয়াদ, ৭৯ আয়াত)। সে বেহেস্ত-দোযখও বিশ্বাস করতো। তাই আল্লাহ তা'য়ালা বলেছিলেন-

لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِمَّنْ تَبِعَكَ–

"আমি তোর অনুসারীদের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো" (সূরা ছোয়াদ, ৮৫ আয়াত)। এতে বুঝা গেল- শয়তান জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কেও জ্ঞাত ছিল।

বস্তুতঃ শয়তান ঈমান (মোফাসসাল) -এর ছয়টি বিষয়ে বিশ্বাসী ছিল- কিন্তু বিশ্বাসী ছিলনা ৭ম ঈমান নবুয়তে। তাই সে কাফেরে পরিণত হলো।

নবুয়ত হলো সীলমোহরের ন্যায়। কাগজের নোটের উপর সরকারী সীলমোহর থাকলেই উহার মূল্য দাঁড়ায় শ' ও হাজারে। অনুরূপ তৌহিদের মূল্য তখনই হবে- যখন তার ওপর নবুয়তের সীলমোহর থাকবে। হাশরের ময়দানে কাফেররাও তাওহীদী শব্দ- "হে আল্লাহ" বলবে- কিন্তু নাজাত পাবেনা।

(২) যদি তৌহিদই মুক্তির জন্য গ্যারান্টি হতো- তাহলে কালেমায় উল্লেখিত রিসালাত অর্থহীন হয়ে যেতো। বুঝা গেল- মুক্তির জন্য শর্ত হলো ঈমানের, আর ঈমানের জন্য শর্ত হলো তাওহীদ ও রিসালাতের।

(৩) আল্লাহ পাক কোরআন মজিদে আমাদেরকে কখনও "তাওহিদী জনতা" বলে উল্লেখ করেন নি -বরং মুমিনীন ও মুমিনাত বলে সম্বোধন করেছেন। বুঝা গেল- শুধু তাওহীদে বিশ্বাসীরা (মুয়াহ্হিদুন) মোমেন নয়। তারা মৌলবাদী। তাদের কাছে রিসালাতের গুরুত্ব খুবই নগন্য। রাসুল তাদের মতে আল্লাহর মোকাবেলায় চামার সদৃশ। (দেখুন- তাকভিয়াতুল ঈমান)।

(৪) মুসলমান ছাড়া অনেক জাতি আছে- যারা এক আল্লাহতে বিশ্বাসী বলে দাবী করে। যেমন শিখ, আর্য এবং কিছু খৃষ্টান। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদেরকে মুমিন বলা যাবে না। কেননা, তারা নবুয়তে বিশ্বাসী নয়। তাই তাওহীদকে নবুয়তের দর্পনেই দেখতে হবে।

(৫) হযরত আদম (আঃ) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত অনেক আসমানী ধর্ম এসেছে। কিন্তু অন্য কোন নবীর ধর্মকে ইসলাম ধর্ম বলা হয়নি। কোন উম্মতই নিজেদেরকে মুসলমান জাতি বলে পরিচয় দেয়নি। নবীর নামেই তাঁদের ধর্মের নাম ছিল। তাদের তাওহীদ ও ধর্ম বিশ্বাস আমাদের মতই ছিল- আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, নবীর প্রতি বিশ্বাস, হাশর নশরের প্রতি বিশ্বাস, আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস, ফিরিস্তার প্রতি বিশ্বাস,

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তাক্বদীরের ওপর বিশ্বাস- সবই আমাদের মত ছিল- কিন্তু নবী ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন। তাই কারো ধর্মের নাম মূছায়ী, কারো ধর্মের নাম ঈছায়ী হয়েছে। ধর্ম হয় নবুয়তের দ্বারা- শুধু তাওহীদের দ্বারা নয়।

(৬) কবরে মুক্তি পাওয়ার শেষ পরীক্ষা হলো নবুয়তের পরিচয়। রব ও দ্বীন সম্পর্কে প্রশ্ন করার পর তৃতীয় প্রশ্ন করা হবে- হুযুরের নবুয়ত সম্পর্কে। নবী পরিচিতির ওপরেই কবরবাসীর ভাগ্য নির্ধারিত হবে- জান্নাতী হিসাবে। যদি তাওহীদের স্বীকৃতিই যথেষ্ট হতো- তাহলে নবুয়তের প্রশ্নের প্রয়োজন হতো না। তাই বুঝা গেল- মুক্তি শুধু তাওহীদের ওপর নির্ভরশীল নয় -বরং ঈমানের উপর, আর ঈমানের ভিত্তি হলো তাওহীদও রিসালাতের ওপর বিশ্বাস।

একটি সুক্ষ্ম তত্ত্ব ঃ

কবরে তিনটি প্রশ্ন করা হবে- (১) তোমার রব কে? (২) তোমার ধর্ম কি? (৩) এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারনা ও বিশ্বাস কি ধরণের ছিল?

এখানে লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে- প্রথম দুইটি প্রশ্ন হলো থিউরিটিক্যাল এবং তৃতীয়টি হলো প্র্যাকটিক্যাল। প্রথম দুইটিতে هٰذَا বা ("এই") শব্দ নেই। কেননা, আল্লাহ এবং ধর্মকে কবরে দেখানো হবে না- দেখানো হবে শুধু নবীজিকে আর বলা হবে "এই ব্যক্তি" কে? তাই নবীজিকে হাযির- নাযির বলা হয়। দুনিয়ায় থাকতে তুমি কী বলতে? বড় ভাই- নাকি নিজের মত- নাকি বে-মেছাল নবী বল্‌তে? বে-মেছাল নবী বলে বিশ্বাস করলেই মুক্তি দেয়া হবে। প্র্যাকটিকাল পরীক্ষায় পাশ করলে সব পাশ- আর ফেল করলে সব ফেল।

একাদশ অধ্যায় ঃ

বিরোধীদের তিনটি আপত্তি খন্ডন

১নং আপত্তি ঃ একই সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার

লোককে দাফন করা হয়। ঐ একই সময় নবীজিকে কিভাবে প্রত্যেক জায়গায় দেখানো হবে?

উত্তর ঃ একটি সূর্য একই সময়ে লক্ষ লক্ষ জায়গায় দেখা যায়- আর বলা হয়- এটা সূর্য। টেলিভিশনে একই ব্যক্তিকে লক্ষ লক্ষ জায়গায় দেখানো সম্ভব। দুনিয়ার কারিগর যদি এটা পারে- তাহলে মহা কারিগর আল্লাহ তায়ালা কেন নবীজিকে লক্ষ কবরে দেখাতে পারবেন না?

সূর্যের আলো আর বিদ্যুতের যদি এই শক্তি হয়- তাহলে নূরের নবীর শক্তি সম্পর্কে আপত্তি করার অবকাশ কোথায়? আল্লাহর কুদরতের ওপর অবিশ্বাসীরাই কাফের।

২নং আপত্তি ঃ যারা নবীজিকে দেখেনি- তারা কিভাবে কবরে নবীজিকে চিনতে পারবে? আর আবু জাহেল প্রমূখ নবীজিকে দেখা সত্ত্বেও কেন চিন্‌তে পারবে না?

উত্তর ঃ যাদের অন্তরে নবীজির নূর ও এশ্‌ক রয়েছে- তারা ঐ এশ্‌কের নূর দ্বারাই নবীজিকে চিনতে পারবে। কেননা, তিনি তো নূর। নূর নূরকে চিন্‌তে অসুবিধা হবেনা। অনেক ভাগ্যবান ব্যক্তি স্বপ্নে নবীজিকে দেখেই চিনতে পারেন- পূর্ব পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না।

৩নং আপত্তি ঃ কিছু জ্ঞানপাপী আছে- যারা বলে- هٰذَا শব্দ দ্বারা عَهْدِذِهْنِيْ বা মানসপটে আঁকা স্মৃতির প্রতি ইঙ্গিত করা হবে- عَهْدِخَارِجِيْ বা বাস্তবে নবীকে হাযির করা হবেনা। আরবীতে هٰذَا শব্দটি عَهْدِ ذِهْنِيْ এবং عَهْدِخَارِجِيْ -উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাদের মতে هٰذَا শব্দটি দ্বারা এখানে عَهْدِذِهْنِيْ বুঝানো হয়েছে- عَهْدِخَارِجِيْ -এর জন্য বুঝানো হয়নি।

আর একদল বলে- কবরে নবীজির ছবি দেখানো হবে- মূল নবীকে নয়।

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

উত্তর ঃ আল্লাহ এবং ধর্ম সম্পর্কে তো সকল মোমেনের অন্তরেই ধারনা ছিল। তা সত্ত্বেও هٰذَا ব্যবহার করা হয়নি। বুঝা গেল- هٰذَا শব্দটি عَهْدِذِهْنِيْ -এর জন্য ব্যবহার করা হয়নি -বরং عَهْدِخَارِجِيْ -এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, পরবর্তী শব্দটি হচ্ছে رَجُلٌ -যার অর্থ দেহধারী ব্যক্তি। দেহধারীকে দেখা যায়- তাই ইঙ্গিত হবে উপস্থিত নবীর প্রতি। ইহাকেই আরবীতে عَهْدِ خَارِجِيْ বলে। আর যারা বলে ছবি দেখানো হবে- তাদের ধারনাও ভুল। কেননা, هٰذَا الرَّجُلَ মানুষকেই বলা হয়- ছবিকে কেউ কোন দিন هٰذَا الرَّجُلَ বলেনা।

বুঝা গেল- নবীজীকে স্বশরীরেই কবরে হাযির করা হবে।

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ

নবীজির ইল্‌ম

নবী (نَبِيٌّ) শব্দটির মূল ধাতু হচ্ছে নাবাউন (نَبَاءٌ)। নবী (نَبِيٌّ) শব্দটি আরবী ব্যাকরণ মতে সিফাতে মুশাববাহ্। নবী শব্দের অর্থ হলো- গায়েবের সংবাদদাতা। কারীমুন, রাহীমুন- শব্দগুলোও সিফাতে মুশাববাহ। নবী, কারীম, রাহীম- এগুলো সিফাতে মুশাববাহ হয়ে ইছমে ফায়েল (اِسْمِ فَاعِلْ) -এর অর্থ বহনকারী। অর্থাৎ নবী অর্থ- গায়েবের সংবাদদাতা।

দুনিয়ার সংবাদদাতা বা হালাল হারামের সংবাদদাতাকে নবী বলা হয় না। কেননা, এগুলো জাগতিক বিষয়। জাগতিক বিষয়ের সংবাদদাতাকে আলেম, পন্ডিত, মুজাদ্দিদ ও মুজতাহিদ -ইত্যাদি বলা হয়- কিন্তু নবী বলা হয় না। নবী বলা হয় এমন সংবাদদাতা ও সংবাদ বহনকারীকে- যিনি দুনিয়াবাসীকে আরশের সংবাদ ও গায়েবের সংবাদ শুনান। যেখানে খবরাখবর আদান প্রদানের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানীদের চিন্তা চেতনা

অকেজো- সেখানকার সংবাদদাতাকেই নবী বলা হয়। আমাদের প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন সেই অদৃশ্যজগতের বড় সংবাদদাতা নবী। যারা তাঁর ইল্‌মে গায়েবকে (আতায়ীকে) অস্বীকার করে- মূলতঃ তারা নবুয়্যতকেই অস্বীকার করে। নবী শব্দের অর্থই গায়েবী সংবাদ পরিবেশন করা। কেননা, ইল্‌মে গায়েব নবুয়তের অবিচ্ছেদ্য অংশ (সীরাতুন্নবী, ৩য় খন্ড, ১৬-১৭ পৃষ্ঠা)। তারা নবী শব্দ ব্যবহার করে সত্য- কিন্তু তার অর্থ কোন সময়েই বলে না।

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাকার সংবাদদাতা- নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলোঃ-

(১) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিষন্ন মনে বসা ছিলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন- হে জাবির! কেন এত বিষন্নমন? হযরত জাবির (রাঃ) আরয করলেন- আমার পিতা হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তিনি আমার ছয় বোন ও কিছু ঋণ রেখে গেছেন। এসব চিন্তাই আমার বিষন্নতার কারণ। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথা শুনে বললেন- আমি কি তোমাকে এমন কিছু জানাবো- যদ্বারা তোমার বিষন্নতা দূর হয়ে যাবে? হযরত জাবির (রাঃ) আরয করলেন- অবশ্যই। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- অদ্যাবধি কোন মৃত ব্যক্তির সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেন নি। তোমার শহীদ পিতাই প্রথম ব্যক্তি- যাঁর সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন। আল্লাহ তোমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন- "হে আবদুল্লাহ! তুমি শাহাদতের বিনিময়ে আমার কাছে কী চাও? তোমার পিতা বললেন- হে পরওয়ারদিগার! আমি শাহাদতের মধ্যে যে স্বাদ পেয়েছি- দুনিয়াতে গিয়ে পুনঃ সেই স্বাদ পেতে চাই। আমাকে পুনঃ দুনিয়ায় পাঠাও। এই শাহাদতের নেয়ামত ও স্বাদ পুনঃ পেতে চাই। আল্লাহ তোমার পিতাকে বললেন- "একবার পরীক্ষায় পাশ করিয়ে

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

দ্বিতীয়বার পরীক্ষা নেওয়া- নিয়ম বিরুদ্ধ"। (বুখারী)।

(২) এক মহিলা সাহাবী প্রিয় নবীর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আমার এক যুবক পুত্র আপনার সাথে বদর যুদ্ধে জেহাদ করে শাহাদাত বরণ করেছে। তার নাম হাবেজ। সে এখন কী অবস্থায় আছে- আমি তা দেখতে চাই। যদি তাকে জান্নাতবাসী দেখি- তাহলে সবর করবো। আর যদি সে দোযখবাসী হয়ে থাকে- তাহলে এমন কান্না করবো- যা পৃথিবীতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে শান্তনা দিয়ে বললেন- "আমি দেখছি- তোমার শহীদ ছেলে সর্বোচ্চ জান্নাত- জান্নাতুল ফিরদাউসে রয়েছে"। সোব্হানাল্লাহ্!

(৩) জনৈক সাহাবীকে (মায়েয আসলামী) প্রিয় নবীর জীবদ্দশায় শাস্তিমূলক অপরাধের কারণে পাথর নিক্ষেপ করে ছঙ্গেছার করা হয়েছিল। অন্য একজন সাহাবী উক্ত সাহাবীর অপরাধকে মন্দ হিসাবে উল্লেখ করলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উক্তি শুনে বললেন- "ওকে তুমি মন্দ বলছো- অথচ সে এখন বেহেস্তের ঝর্ণাধারার তৃপ্তিতে অবগাহন করছে"।

প্রিয় পাঠক! উপরের তিনটি ঘটনাই গায়েবী জগতের বিষয়। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় অবস্থান করে গায়েবী জগতের সংবাদ দিচ্ছেন। এটাকেই ইসলামী পরিভাষায় "ইলমে গায়েব আতায়ী" বলা হয়। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। অস্বীকার করলে ঈমানই থাকবে না।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়- হযরত জাবিরের পিতার অবস্থা, মহিলার যুবক পুত্রের জান্নাতে অবস্থান এবং সাজাপ্রাপ্ত সাহাবীর জান্নাতে বিচরণ -এই তিনটি গায়েবী সংবাদ নবীজী সাথে সাথে দিলেন- কিসের ভিত্তিতে? জিব্রাঈলের অহীর মাধ্যমে? তাহলে তো অবশ্যই তার উল্লেখ থাকতো। প্রশ্ন করা মাত্র চিন্তা ভাবনা ছাড়া এবং জিব্রাঈলের আগমন ব্যতিরেকেই তিনি ঐ গাযেবী সংবাদ দিয়েছিলেন। এই গায়েবী সংবাদ প্রদান হচ্ছে নবুয়তের সহজাত ইল্ম। আল্লাহ পাক নবীগণকে এই গায়েবী এলেমের

জ্ঞান প্রদান করেই পাঠিয়েছেন। তাঁদের এই জ্ঞানকে বলা হয় ইলমে হুযুরী (عِلْمِ حُضُوْرِیْ) বা ঐশীলব্ধ জ্ঞান। আর আমাদের জ্ঞানকে বলা হয় ইলমে হুছুলী (عِلْمِ حُصُوْلِیْ) বা অর্জিত জ্ঞান

স্মরণ রাখা একান্ত দরকার- নবীগণের তিনটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট রয়েছে- যা অন্য কারুর মধ্যে নেই। যথা (১) ইলমে গায়েব বা গায়েব সম্পর্কে অবহিত থাকা। (২) ফিরিস্তা দর্শন। (৩) ইলমে বদিহী বা হুযুরী। (দেখুন দেওবন্দের আলেম সোলায়মান নদভীর লিখিত সীরাতুন্নবী, ৩য় খন্ড ১৬/১৭ পৃষ্ঠা উর্দ্দু সংস্করণ)।

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ পাক কীভাবে ইলমে গায়েব শিক্ষা দিয়েছেন- তা দেখুন- কোরআন মজিদ সূরা নিসা, আয়াত নম্বর ১১৩। আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ

وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ-

অর্থাৎ- "হে প্রিয় হাবীব! আপনার প্রতিপালক (অতীতে) আপনাকে অজানা বিষয় নিজে শিক্ষা দিয়েছেন"। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহঃ) বলেছেন-

اَیْ مِنَ الْاَحْکَامِ وَالْغَیْبِ -

অর্থাৎ- "শরীয়তের বিধি-বিধান ও ইলমে গায়েব আপনাকে অতীতে শিক্ষা দিয়েছেন"। (তাফসীরে জালালাঈন- সূরা নিসা, ১১৩ আয়াত)।

বুঝা গেল- নবীজির ইলমে গায়েব খোদা প্রদত্ত। যারা তাফসীর দেখেনা- তারাই বলে নবীজির ইল্মে গায়েব আতায়ী ছিলনা। অথচ কোরআন মজিদের অত্র আয়াতেই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ-ই নবীজিকে অতীতে ইলমে গায়েব শিক্ষা দিয়েছেন। খোদার কথা অস্বীকার করা কুফরীর নামান্তর নয় কি?

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

একটি সুক্ষ্ম তত্ত্ব ঃ

কোরআন মজিদে ইলমে গায়েবকে আল্লাহর অধিকার ভূক্ত বলা হয়েছে এবং নিজে নিজে অন্য কেউ জানেনা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এরূপ ঘোষণাই প্রমাণ করছে- আল্লাহ যাকে জানিয়েছেন- তিনি জানেন।

নিজে নিজে কেউ গায়েব জানেনা- তার প্রমাণ হলো-

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ-

"বলুন হে প্রিয় রাসুল! আসমান জমীনের কেউ নিজে নিজে গায়েব জানেনা- নিজে নিজে জানেন একমাত্র আল্লাহ"। (২০ পারা প্রথম রুকু)।

নিজে নিজে জানার নাম ইলমে গায়েব যাতী। ইহা আল্লাহর জন্য খাস। আর আল্লাহ যাকে জানান বা দান করেন- তিনি প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জানেন- ইহাকে বলা হয় ইলমে গায়েব আতায়ী। ইহা রাসুলে পাকের জন্য খাস। যার জন্য যা খাস- তা অন্যের বেলায় মানা কুফরী। আল্লাহর ইলমে গায়েব যাতী অন্যের জন্য স্বীকার করা যেমন কুফরী- তদ্রুপ নবীজির ইলমে গায়েব আতায়ী আল্লাহর জন্য স্বীকার করাও কুফরী- কেননা, আল্লাহর ইলম আতায়ী নয় -বরং যাতী। কুরআন মজিদের ৫টি আয়াত দ্বারা নবীজীর ইলমে গায়েব আতায়ী প্রমাণিত। যথাস্থানে দেখে নিন।

আলেমদের বুঝার জন্য আর একটি তথ্য হলো-

عَلِمَ-يَعْلَمُ অর্থ হলো নিজে নিজে জানা। ইহা লাযেম- এর ছিগা এবং عَلَّمَ يُعَلِّمُ হলো- মুতাআদ্দি -এর ছিগা। এর অর্থ হলো- অন্যের মাধ্যমে জানা। আল্লাহর কালামে লাযেম বা নিজে নিজে ইলমে গায়েব জানার বিষয়টি অন্যের বেলায় نَفِىْ বা অস্বীকার করা হয়েছে সত্য- কিন্তু নবীজীকে জানিয়ে দেওয়া ও শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টিরও স্বীকৃতি اِثْبَاتْ রয়েছে। ইলমে গায়েব শিক্ষা দেওয়ার স্বীকৃতি রয়েছে নবীজির জন্য এবং

নিজে নিজে না জানার বিষয়টি হচ্ছে আমভাবে অন্যের ক্ষেত্রে। নিজে নিজে ইলমে গায়েব জানাকে বলে ইলমে গায়েব যাতী- যা আল্লাহর জন্য খাস এবং ইলমে গায়েব শিক্ষা দেওয়াকে বলে ইলমে গায়েব আতায়ী- যা নবীর জন্য খাস। নবীজীর ইল্‌মে গায়েব আতায়ীর স্বীকৃতি রয়েছে সূরা নিসার ১১৩ নম্বরসহ ৫টি আয়াতের মধ্যে। এই পার্থক্য না জানার কারণেই কিছু বিপথগামী আলেম সমাজের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তাই হক্বপন্থী আলেমগণ ২০ পারার উক্ত আয়াত এবং সূরা নিসার ১১৩ আয়াত সহ ৫টি আয়াতের তাফসীর ভালভাবে দেখে নিবেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ

অন্যান্য নবীগণের ইলমে গায়েব

(১) হযরত আদম আলাইহিস সালাম ছিলেন প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী। তাঁর ইলম সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا -

"আল্লাহ তায়ালা আদম আলাইহিস সালামকে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর নাম ও গুণাগুণ সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন"। শুধু শিক্ষা দেয়া নয়- বরং ভূমন্ডল থেকে নভোমন্ডল পর্যন্ত যাবতীয় বস্তু তাঁর গোচরীভূত করেছেন। অণু থেকে পাহাড়, বিন্দু থেকে সিন্ধু, ভূমন্ডল থেকে নভোমন্ডল পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে এবং হবে- সেসব বিষয়েরও শিক্ষা দান করেছেন। (তাফসীরে জালালাঈন)। এতে প্রতীয়মান হলো- নবী হলেন অদৃশ্য জগতের গায়েবী সংবাদদাতা।

(২) হযরত ঈছা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক ৫টি মো'জিযা। যথাঃ- মাটি দিয়ে জীবন্ত পাখী তৈরী করা, অন্ধকে দৃষ্টি দান করা, কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করা, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা এবং অদৃশ্য সম্পদের সংবাদ দেয়া- এই পঞ্চ মোজেযা দান করেছিলেন। তাঁর ইলমে গায়েব সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ-

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ-

অর্থঃ- "হযরত ঈছা আলাইহিস সালাম হাওয়ারীদেরকে বললেন- "আমি তোমাদেরকে গায়েবী সংবাদের মাধ্যমে বলে দিতে পারি- তোমরা কি কি খাচ্ছো এবং তোমাদের ঘরে কি কি জমা করে রাখছো"। (সূরা আলে ইমরান, ৪৯ আয়াত)।

অত্র আয়াতে تَأْكُلُونَ এবং تَدَّخِرُونَ দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যত- উভয়কালই বুঝাচ্ছে- অর্থাৎ "ভবিষ্যতে তোমরা কি কি খাবে এবং কি কি জমা করে রাখবে- তাও আমি না দেখেই বলে দিতে পারি"।

বুঝা গেল- নবীগণের ইল্‌ম অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। ভূতও ভবিষ্যৎ নবীগণের নখদর্পনে থাকে। আমাদের প্রিয়নবীর ভূতও ভবিষ্যতের ইল্‌মে গায়েব তো প্রশ্নাতীত বিষয়।

চতুর্দশ অধ্যায় ঃ

প্রিয় নবী (দঃ) -এর কিছু ইল্‌মে গায়েব

(১) মিশকাত শরীফে "ফাযায়েলে ওমর (রাঃ)" অধ্যায়ে বর্ণিত আছে- একদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহার কামরায় প্রবেশ করলেন। তখন ছিল রাত্রি এবং আকাশ ছিল তারকারাজীতে সুশোভিত। হযরত আয়েশা (রাঃ) আরয করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! এমন কোন ব্যক্তি আছে কি- যার ইবাদত ও নেকী তারকারাজীর সমসংখ্যক? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- হ্যাঁ, ওমরের"।

হযরত আয়েশা (রাঃ) এতে একটু মনঃক্ষন্না হলেন- কেননা, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পিতা হযরত আবু বকর (রাঃ) -এর নেকীর কোন উল্লেখ করেন নি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মনোভাব টের পেয়ে বললেন- "তোমার পিতার একরাত্রের নেকী হযরত

ওমরের সারাজীবনের নেকীর চেয়েও বেশী"।

উল্লেখ্য- ঐ একটি রাত্রি ছিল গারে ছাওরের প্রথম রাত্রি- যে রাত্রিতে হযরত আবু বকর (রাঃ) সাপের দংশন হজম করে নবীজিকে আরাম দিয়েছিলেন।

এখানে বুঝার বিষয় হলো- আকাশের তারকারাজীর সংখ্যা সম্পর্কে হুযুরের জ্ঞান বা ইলেমের পরিমাণ। তারকারাজী বিভিন্ন আসমানে রয়েছে। এমনসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকা রয়েছে- যার অস্তিত্ব এখনও পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। কিন্তু হুযুরের দৃষ্টিতে ঐসব তারকাও ছিল। মা আয়েশা (রাঃ) -এর আক্বিদা ছিল- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দৃষ্টি আরশ ও ফরশে বিস্তৃত। ইহাই ইল্‌মে গায়েব (আতায়ী)।

তাই কোন আশেক কবি গেয়েছেন-

سر عرش پر ھے تیری گزر

دل فرش پرھے تیری نظر-

مکلوت وملك میں کوئی شئ نھیں

وہ جو تجہ پر عیان نھیں-

অর্থ- "আরশের উপর ভ্রমন তোমার- দিলের ফরশে নযর তোমার,

উর্দ্ধজগতে নেই কিছু এমন- যা অজানা বিষয় তোমার"।

উক্ত ঘটনায় কয়েকটি শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে-

ক) হযরত আয়েশা (রাঃ) -এর তারকা সম্পর্কীত প্রশ্নের জবাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা বলেন নি যে, অপেক্ষা করো- জিব্রাঈল আসুক- তাঁকে জিজ্ঞেস করে তারকার সংখ্যা বলবো। অপেক্ষা না করেই বলে দিলেন।

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

খ) একথাও তিনি বলেন নি যে, একটু চিন্তা করে হিসাব করে তারকার সংখ্যা তোমাকে বলে দিব -বরং সাথে সাথেই বলে দিলেন- "আকাশের তারকার সংখ্যা যত, ওমরের নেকীর সংখ্যাও তত"। নবীজির মহাশুন্যের জ্ঞান হলো আল্লাহ প্রদত্ত ইলমে গায়েব, ইল্‌মে লাদুন্নী বা ইল্‌মে হুযুরী।

গ) হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) -এর নেকীর পরিমাণ যে নবী জানেন- সেই নবী সমস্ত উম্মতের নেক আমল সম্পর্কেও অবহিত রয়েছেন। তিনি হলেন উম্মতের সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত নবী। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে-

اِنَّمَا اَعْمَالُكُمْ تُعْرَضُوْنَ عَلَيَّ فَاِنْ رَاَيْتُ فِيْهَا خَيْرًا حَمِدْتُ اللّٰهَ وَاِنْ رَاَيْتُ شَرًّا اسْتَغْفِرُ لَكُمْ-

অর্থ- "তোমাদের যাবতীয় আমল (মন্দ বা ভাল) আমার দৃষ্টিতে আনা হয়। যদি ভাল দেখি- তাহলে আল্লাহর প্রশংসা করি। আর যদি মন্দ দেখি- তাহলে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি"।

(২) মিশকাত শরীফে "সদকা" বিষয়ক পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবিগণ জানতে চাইলেন-

اَيُّنَا اَوَّلُ لُحُوْقًا بِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

অর্থ- "হে আল্লাহর প্রিয় রাসুল! আমাদের মধ্যে সবার আগে কে আপনার সাথে মিলিত হবে"?

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে সাথে বললেন- اَطْوَلُكُنَّ يَدًا

"তোমাদের মধ্যে যাঁর হাত লম্বা- তিনি"।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন- আমরা হাত মেপে দেখতে পেলাম- হুযুরের দ্বিতীয় বিবি হযরত সওদা (রাঃ) -এর হাত বেশী লম্বা। আমাদের ধারনা- তিনিই আমাদের মধ্যে প্রথম ইনতিকাল করবেন। কিন্তু আমাদের ভুল

ভাঙলো তখন- যখন দেখলাম- হযরত জয়নব বিন্‌তে খোযায়মা (রাঃ) আমাদের মধ্যে প্রথমে ইনতিকাল করলেন। তখন বুঝতে পারলাম- লম্বা হাত মানে সদকা খয়রাত করা। কেননা, আমাদের মধ্যে হযরত জয়নবই বেশী দান খয়রাত করতেন"। (মিশকাত)।

উক্ত হাদীসে যে কয়টি বিষয় জানা গেলো- তা হচ্ছে ঃ

ক) হুযুরের বিবিগণের এই আক্বিদা ছিল যে, কে কখন মারা যাবে- তা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানেন। তা না হলে উক্ত প্রশ্ন করতেন না। ইহা মৃত্যু সম্পর্কীয় ইল্‌মে গায়েব- যা আল্লাহর পঞ্চ এলেমের একটি।

খ) "আপনার সাথে প্রথম কে মিলিত হবেন" -এই প্রশ্নের দ্বারা বুঝা গেল- ওনাদের ইনতিকাল ঈমানের উপর হবে- এই বিষয়টিও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা জানতেন বলেই ঐরূপ উত্তর দিয়েছিলেন।

গ) "কে কখন মারা যাবে"- তা আল্লাহর পঞ্চ এলেমের অন্তর্ভূক্ত- যাকে "মাফাতীহুল গায়ব" বলা হয়। **এক শ্রেণীর লোক দাবী করে- এই এলম আল্লাহর জন্য খাস- অন্য কেউ মোটেই জানে না।** তাদের এই বদ ও বাতিল আক্বিদা অত্র সহীহ হাদীস দ্বারা খন্ডন হয়ে গেলো। কেননা, উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) সহ হুযুরের সমস্ত বিবিগণের আক্বিদা ছিল- আল্লাহ তায়ালা নবীজিকে পঞ্চ এলেমের অন্যতম এলেমও দান করেছেন। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সঠিক আক্বিদা।

(৩) বুখারী শরীফে "প্রস্রাব থেকে সতর্ক থাকা" শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখ আছে- একদা নবী করিম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি স্থান অতিক্রম করছিলেন। তিনি পার্শের দুইটি কবরের প্রতি ইঙ্গিত করে এরশাদ করলেন-

هُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ بِكَبِيْرٍ الخ

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অর্থ- "এই কবরবাসীদ্বয়ের আযাব হচ্ছে। তাদের আযাবের কারণ এমন দুটি কাজ- যার থেকে বেঁচে থাকা তেমন কঠিন ছিলনা। তাদের একজন চোগলখুরী করতো, আর একজন উটের প্রস্রাব থেকে সতর্ক ছিল না"।

অতঃপর একটি তাজা খেজুরের ডাল নিয়ে দু'ভাগ করে দু'জনের কবরে গেড়ে বললেন- "যতক্ষণ ডাল দুটি তাজা থাকবে- তাদের কবরের আযাব হালকা হবে" (বুখারী)।

এ হাদীস থেকে কয়েকটি মাসআলা জানা যায়-

ক) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দৃষ্টি শক্তিকে মাটি আড়াল করতে পারেনা। মাটির নীচেও তিনি দেখেন। হাদীস শরীফে আছে- "আল্লাহ তায়ালা আকাশ জমীন হুযুরের দৃষ্টির সামনে উন্মুক্ত করে রেখেছেন। কিয়ামত অবধি তিনি সব কিছু এক নজরে হাতের তালুর ন্যায় দেখতে থাকবেন" (তিবরানী)।

খ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত উম্মতের নেকী, বদী ও তার পরিমাণ সম্পর্কে অবহিত। উক্ত দুই ব্যক্তি দুনিয়াতে কি কাজ করতো- তা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন। একজন করতো চোগলখুরী, দ্বিতীয়জন ছিল উটের বা নিজের প্রস্রাবের ছিটাফোটা থেকে অসতর্ক। তিনি উম্মতের যাবতীয় আমলের গায়েবী সংবাদদাতা নবী।

গ) কবর আযাব হালকা করার জন্য তাজা ডাল, তাজা ফুল, তাজা ঘাস- ইত্যাদি কবরে স্থাপন করা বা লাগানো অত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কারণ তাজা বস্তু আল্লাহর তাসবীহ পড়ে। এই তাসবীহের গুনে কবরবাসীর আযাব হালকা হয়।

ঘ) কবরের পার্শে কোরআন তিলাওয়াত করলেও কবরের আযাব হালকা হয় এবং মাফ হয়। ডাল আর ফুলের তাসবীহ্ যদি আযাব হালকা হওয়ার কারণ হয়- তাহলে মানুষের তাসবীহ্ যে আরো বেশী উপকারী হবে- তাতে কোন সন্দেহ নেই। (ফতোয়ায়ে শামী)।

ঙ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ায়, কবরে, হাশরে, মিজানে, পুলসিরাতে- সর্বত্র উম্মতের খবরাখবর রাখেন ও রাখবেন এবং সাহায্য করেন ও করবেন। হাশরে সর্ব প্রথম তিনিই গমন করবেন- যাতে তাঁর আগোচরে কিছু না ঘটে। তিনিই বিচার অনুষ্ঠানের প্রথম সুপারিশ করবেন। তারপর অন্যান্য নবীগণ নিজ নিজ উম্মতের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন এবং তা গৃহীত হবে। বিচার অনুষ্ঠানের সুপারিশ একমাত্র আমাদের প্রিয় নবীর জন্য খাস। এটাকে শাফাআতে কোব্‌রা বলা হয়। (হাদিকাতুন নাদিয়া)।

বিঃদ্রঃ- আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাশরে পাঁচ প্রকারের সুপারিশ করবেন- (১) বিচার অনুষ্ঠানের জন্য। (২) বিনা হিসাবে ৪৯০ কোটি লোকের জান্নাতে প্রবেশের জন্য। (৩) জান্নাতীদের পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। (৪) জাহান্নামের তালিকাভূক্ত কিছু মোমেনদের নাম খারিজ করার জন্য। (৫) জাহান্নামে প্রবিষ্টদের বের করে আনার জন্য (হাদিকাতুন-নাদিয়া, আল্লামা আবদুল গণি নাব্‌লুসী)।

পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ

শাফাআত বিষয়ক কতিপয় জ্ঞাতব্য

(১) "কালেমা তৈয়্যেবার" লেখক মাওলানা আঃ রহীম বলেছেন- "শাফাআত অর্থ সাধারণ সুপারিশ- যা কবুল হতেও পারে- আবার নাও হতে পারে"।

এই তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। বুখারী শরীফের হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে- আল্লাহ তায়ালা রোয হাশরে নবীজীর সিজদায় সন্তুষ্ট হয়ে বলবেন-

اِرْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ - قُلْ تُسْمَعْ - سَلْ تُعْطَهْ - وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ -

অর্থাৎ- "হে প্রিয় হাবীব! আপনি সিজদা হতে মাথা তুলুন এবং যা বলার

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বলুন- তা গৃহীত হবে। যা চাওয়ার চান- তা দেয়া হবে। যা সুপারিশ করবেন- তা কবুল করা হবে"।

এখানে শাফাআত কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা দুনিয়াতেই দেয়া হয়ে গেছে। "কবুল হতে পারে- নাও হতে পারে" -এমন দোদোল্যমান কথা হাদীসে নেই।

(২) "ইংল্যান্ডের ভাষণে" মিঃ মউদূদী বলেছেন- "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরের কল্যাণ তো দূরের কথা- নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ করতেও অক্ষম"। (লন্ডনের ভাষণ)।

তার এই কথা শানে রিসালাতের ওপর মারাত্মক আঘাত স্বরূপ। হাশরের ময়দানের বিপদ হলো সবচেয়ে বড় বিপদ। ঐ বিপদের বন্ধু ও কান্ডারী হবেন প্রিয়নবী মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সমস্ত হাশরবাসীই ঐ মহাবিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য তাঁর দ্বারস্থ হবে। তিনিই তখন সুপারিশ করে বিচার অনুষ্ঠান শুরু করাবেন। সুতরাং তিনি কল্যাণকারী।

(৩) যারা বলে- রাসুলের নিকট সাহায্য চাওয়া শিরিক- তারাই হাশরের দিনে সাহায্যের জন্য বেশী পেরেশান হয়ে দৌড়াদৌড়ি করবে এবং নবীগণের দ্বারস্থ হবে। অবশেষে সব জায়গা থেকে নিরাশ হয়ে নবীজির কাছে যাবে। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলবেন না যে, তোমরা তো দুনিয়াতে আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করাকে শিরিক বলেছিলে- কাজেই তোমাদের জন্য সুপারিশ করবোনা। বরং তিনি দোস্ত-দুষমন নির্বিশেষে সকলের জন্যই সুপারিশ করবেন।

(৪) দুনিয়াতে যারা সুপারিশকে শিরিক বলতো- তাদের ভাষ্যমতে সেই কথিত শিরিক দিয়েই আল্লাহ তায়ালা বিচার শুরু করবেন। আমাদের মতে তা শিরিক নয়। দুনিয়াতে নবীজির সাহায্য প্রার্থনা করা সাহাবীগণের সুন্নাত। তাঁরা যেকোন বিপদে নবীজির দ্বারস্থ হতেন এবং হুযুরের কাছে প্রার্থনা করতেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে

নিয়ম কানুন বাতলে দিতেন।

(৫) আল্লাহ পাক নবীজিকে উছিলা বা মাধ্যম বানিয়ে গুনাহ ক্ষমার প্রার্থনা করার জন্য আমাদেরকে পাক কালামে শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেন-

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا -

অর্থ-"তারা যদি গুনাহ করে ক্ষমার উদ্দেশ্যে আপনার দরবারে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আপনিও তাদের জন্য সুপারিশ করেন- তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী ও দয়ালু হিসাবে পাবে"। (সূরা নিসা, ৬৪ আয়াত)।

উক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু সংবাদদাতা নন -বরং তিনি সাহায্যকারীও বটে। বিপদে আপদে তিনি সাহায্যকারী।

শুধু মানুষ নয়-বনের হরিণী, পালের উট নিজেদের দুঃখ দূর্দশার কথা নবীজির দরবারে পেশ করতো এবং মুক্তি পেতো। প্রমাণিত হলো- আমাদের নবী সাহায্যকারী নবী, ফরিয়াদ কবুলকারী নবী- সাহায্য প্রার্থনা তাঁর কাছেই করা যেতে পারে- যিনি দুঃখ বেদনা ও প্রয়োজনের সব কিছু জানেন। ইহাই কালেমার দ্বিতয়াংশের সারমর্ম।

সংক্ষেপে বুঝে নিন- কালেমার প্রথমাংশ হলো- পাসপোর্ট স্বরূপ এবং দ্বিতীয়াংশ হলো ভিসা স্বরূপ। ভ্রমনের জন্য যেমন পাসপোর্টের প্রয়োজন হয়- তেমনিভাবে ভিসারও প্রয়োজন হয়। ভিসা ছাড়া শুধু পাসপোর্টে ভ্রমন করা যায় না। আল্লাহর কাছে যেতে হলে তাঁর হাবীবের ভিসা লাগবে।

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ষোড়শ অধ্যায় ঃ

ঈমান

ঈমান না হলে মুমিন হয় না। মোমিন না হলে জান্নাত লাভ হয় না। শুধু তৌহিদ জান্নাত লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। কোরআনের ঘোষণা হলো- "যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য জান্নাতুল ফিরদাউস রয়েছে"। সুতরাং জান্নাত লাভের জন্য শুধু তৌহিদ নয় -বরং ঈমান শর্ত। ঈমানের দু'টি অংশ- তৌহিদ ও রিসালাত। **এখন জানতে হবে ঈমানের অর্থ কী এবং সংজ্ঞা কী?**

ঈমানের অর্থঃ ঈমান (اِيْمَانٌ) শব্দটি আমনুন (اَمْنٌ) ধাতু হতে নির্গত- যার অর্থ- নিষ্কৃতি দেওয়া ও নিষ্কৃতি পাওয়া। আল্লাহর এক সিফাতী নাম (مُؤْمِنٌ) মুমিন- অর্থাৎ- শাস্তি হতে নিষ্কৃতিদাতা । বান্দার গুণবাচক নামও মুমিন- (مُؤْمِنٌ) অর্থাৎ- নিষ্কৃতি লাভকারী। বান্দা মুমিন হলে আল্লাহও তার জন্য মুমিন হয়ে যান- অর্থাৎ তাকে আযাব হতে নিষ্কৃতি দেন।

ঈমানের সংজ্ঞাঃ "শরহে আকায়েদে নসফী"তে এভাবে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে-

اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا جَاءَ بِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ - অর্থাৎ- **"নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর কর্তৃক আনীত যাবতীয় বিষয়কে সত্য বলে মেনে নেয়ার নাম ঈমান"।**

এখানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন মূখ্য বিষয় এবং তিনি কর্তৃক আনীত যাবতীয় বিষয় তাঁর সত্যতার উপর নির্ভরশীল। এজন্যই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম দাওয়াত

দিয়েছিলেন- "আমাকে সত্যবাদী মনে করো কিনা? আমি হচ্ছি- প্রকাশ্য সতর্ককারী"। আল্লাহর পরিচয়ের জন্য নবীর ওপর ঈমান আনা পূর্বশর্ত।

ঈমানের প্রাণ ঃ প্রত্যেক বস্তুরই দেহ ও প্রাণ থাকে। তদ্রুপ ঈমানেরও দেহ এবং প্রাণ আছে। সপ্ত ঈমান হচ্ছে দেহ এবং তার প্রাণ হচ্ছে নবীজির মহব্বত। শেফা শরীফ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

حُبُّ النَّبِيِّ هُوَ رُوْحُ الْاِيْمَانِ -

অর্থাৎ- "নবীজির মহব্বতই হচ্ছে ঈমানের প্রাণ"। প্রাণহীন দেহ যেমন মৃত- মহব্বত বিহীন ঈমানও তদ্রুপ মৃত। এজন্যই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহব্বতের উপর বেশী জোর দিয়েছেন এভাবে-

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَ فِيْ رِوَايَةٍ مِنْ نَّفْسِهٖ -

অর্থাৎ- **"তোমাদের পিতা-মাতা, সন্তানাদি, সমস্ত লোক- এমনকি তোমাদের নিজেদের চেয়েও আমাকে বেশী মহব্বত না করা পর্যন্ত তোমরা কেউ মোমেন হতে পারবেনা"** (বুখারী)।

তাই- আল্লামা ইকবাল বলেছেন-

مغز قرآن روح ایمان جان دین

هست حب رحمة للعالمین-

অর্থাৎ- **"কোরআনের সারবস্তু, ঈমানের রূহ এবং দ্বীনের প্রাণ হচ্ছে হোব্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম"।**

আল্লাহ আমাদেরকে কালেমার সঠিক তাৎপর্য্য উপলব্ধি করার তৌফিক দিন। আমীন।

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সপ্তদশ অধ্যায় ঃ

রাসুল ও অন্যান্যদের মধ্যে পার্থক্য (একনজরে)

০১। রাসুল হলেন আল্লাহ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি- ফিরিস্তা বা অন্যান্য মানুষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নয়।

০২। রাসুল হলেন সংবাদদাতা ও প্রশাসনিক কর্তা-ফিরিস্তা জিবরাইল হচ্ছে শুধূ সংবাদবাহক-প্রশাসক নয়।

০৩। রাসুল হলেন মাখদুম- জিবরাইল ফেরেস্তা হচ্ছেন তাঁর খাদেম।

০৪। রাসুল হলেন আল্লাহর আইনের হাকিম- অন্যরা হলো সেই আইনের অধীন।

০৫। মানুষ রাসুলের উম্মত আছে- কিন্তু ফিরিস্তা রাসুলের উম্মত নেই।

০৬। রাসুলের বাণী আইন হয়- ফিরিস্তার বাণী আইন হয় না।

০৭। রাসুল হলেন বা-ইখতিয়ার বা ক্ষমতাবান- ফিরিস্তা হচ্ছে বে-ইখতিয়ার বা ক্ষমতাহীন।

০৮। রাসুল হলেন পবিত্রতা দানকারী -অন্যরা পবিত্রতা গ্রহণকারী।

০৯। রাসুল যত ইচ্ছে বিবাহ করতে পারেন- উম্মত চারের অধিক পারেনা।

১০। রাসুল হলেন ক্বলব বা হৃৎপিন্ড স্বরূপ- উম্মত হচ্ছে দেহ স্বরূপ।

১১। রাসুল হলেন ফয়েয দাতা - উম্মত হচ্ছে ফয়েয গ্রহীতা।

১২। রাসুল হলেন সব কিছুর মাধ্যম - বান্দারা তা নয়।

১৩। রাসুল হলেন আল্লাহর রশি- বান্দারা হচ্ছে সেই রশি ধারক।

১৪। রাসুল হলেন ঈমান- আমরা হলাম মোমেন।

১৫। রাসুল হলেন আল্লাহ হতে গ্রহণকারী - আমরা হচ্ছি রাসুল হতে গ্রহনকারী।

১৬। রাসুল হলেন জাহানের কান্ডারী- আমরা হলাম আরোহী।

১৭। রাসুল হলেন হাদী - আমরা হলাম হেদায়াত গ্রহণকারী।

১৮। রাসুল জন্মসূত্রে আরিফ বিল্লাহ - আমরা তা নই।

১৯। রাসুল আল্লাহ কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত - আমরা মানুষ কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত।

২০। রাসুল জন্মসূত্রে নিষ্পাপ বা মাসুম - অন্য কেউ মাসুম নয়। অলীগন হলেন মাহফুয।

২১। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বচক্ষে আল্লাহর দীদার লাভকারী - অন্য কেউ সাক্ষাৎ দীদার লাভকারী নয়।

২২। রাসূলের উপাধী হাযির ও নাযির - অন্য কেউ হাযির নাযির উপাধীপ্রাপ্ত নয়।

২৩। রাসুলের সত্বা প্রত্যেক কবরে উপস্থিত - অন্য কারো সত্বা নয়।

২৪। রাসুল জান্নাত ও হাউযে কাউছারের মালিক - আমরা জান্নাতের বাসিন্দা ও কাউছার পানকারী।

২৫। রাসুলের নাম আল্লাহর নামের সাথে অঙ্কিত - অন্য কারো নাম অঙ্কিত নয়।

২৬। রাসুলের নামের সাইনবোর্ড জান্নাতের সর্বত্র - অন্য কারো নামের সাইনবোর্ড সেখানে নেই।

২৭। রাসুল মুমিনের প্রাণের চেয়েও বেশী নিকটে - অন্য কেউ এরূপ নয়।

২৮। রাসুল সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমত - অন্যরা রহমতপ্রাপ্ত।

২৯। রাসুল শরিয়ত প্রনেতা - অন্যরা শরিয়তের অনুসারী।

৩০। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরিয়তের আইনে ব্যতিক্রম করতে পারেন- অন্যরা পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম করতে পারে না।

৩১। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুপারিশের মাধ্যমে বিনা হিসাবে জান্নাত দিতে পারেন- অন্য কেউ পারে না।

৩২। সৈয়দ জামাআত আলী শাহ মোহাদ্দেস আলীপুরী (রহঃ) এবং মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রঃ) উল্লেখ করেছেন-

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ মানুষের চেয়ে ২৭গুন উর্দ্ধ মর্যাদায় উন্নীত। যেমনঃ- (১) মানুষ (২) মুমিন (৩) অলী (৪) শহীদ (৫) মুত্তাকী (৬) মুজতাহিদ (৭) আবরার (৮) আওতাদ (৯)

www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আবদাল (১০) কুতুব (১১) কুতুবুল আক্‌তাব (১২) গাউস (১৩) গাউসুল আ'যম (১৪) তাব্‌য়ে তাবেয়ী (১৫) তাবেয়ী (১৬) সাহাবী (১৭) আনসার (১৮) মুহাজির (১৯) সিদ্দীক (২০) নবী (২১) রাসুল (২২) উলুল আয্‌ম (২৩) খলিলুল্লাহ (২৪) খাতামুন্নাবিয়্যীন (২৫) রাহমাতুল্লিল আলামীন (২৬) হাবিবুল্লাহ (২৭) মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)। এরপর শুধু উলুহিয়াতের স্থান।

এগুলো সাধারণ মানুষ এবং রাসুলের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। এছাড়াও হাজার রকম পার্থক্য আছে। এক কথায়- তিনি বে-নজীর ও বে-বিছাল। তিনি কোন ক্ষেত্রেই আমাদের মত নন এবং আমরাও কোন ক্ষেত্রেই তাঁর মতো নই। ইহাই চূড়ান্ত কথা। আমরা তাঁর মুখাপেক্ষী-সমগ্র সৃষ্টিও তাঁর মুখাপেক্ষী। যারা বলবে- তিনি আমাদের মত মানুষ- তাদের অন্তরে বেদ্বীনী রোগ আছে। (ছালাতান ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ)।

লিখা সমাপ্ত ৩০শে এপ্রিল ২০০৫ইং

= ০ =

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)-এর পরিকল্পনা সমূহঃ

১. আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কেন্দ্রীয় অফিস নির্মাণ।

২. আ'লা হযরত সুন্নী একাডেমী প্রতিষ্ঠা ও সুন্নী পল্লী নির্মাণ।

৩. সুন্নী ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

৪. তাফসীর ও মোনাযারা প্রশিক্ষণ।

৫. সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

৬. সুন্নী লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা।

৭. দরজায়ে তাখাচ্ছুছ (এমফিল) খোলা।

৮. দারুল হিফয ওয়াল ক্বিরাত প্রতিষ্ঠা।

৯. ইয়াতীম পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন।

১০. সুন্নী মুবাল্লিগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

১১. মৌলিক গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ শাখা প্রতিষ্ঠা।

www.AmarIslam.com http://khasmujaddedia.wordpress.com/